আবারো সংঘাত
আসাদ বিন হাফিজ
প্রকাশন

ক্রুসেড —৬

আবারো সংঘাত

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন

৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

www.crusadeseries.com

ক্রুসেড - ৬

পাপের ফল

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ : বইমেলা ২০০২
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০০

প্রচ্ছদ :
প্রীতি ডিজাইন সেন্টার

মুদ্রণ :
প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ

CRUSADE-6
Abaru Songhath
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by
Asad bin Hafiz
Published by
Pritee Prokashon
435 ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758
2nd Editition: January 2002
PRICE :
ISBN 984-581-191-4

খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মরণপন লড়াই কাহিনী

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠলো খ্রিস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিল মদ ও নেশার দ্রব্য। ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী গোয়েন্দা। বড় বড় সেনা অফিসার এবং আমীর ওমরাদের হারেমগুলোতে ওদের ঢুকিয়ে দিল নানা কৌশলে। ভাসমান পতিতা ছড়িয়ে দিল সর্বত্র। মদ, জুয়া আর বেহায়াপনার স্রোত বইয়ে দিল শহরগুলোতে।

একদিকে সশস্ত্র লড়াই – অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

ক্রুসেড

সেই সব শিহরিত, রোমাঞ্চিত ঘটনার শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনায় ভরপুর ইতিহাস আশ্রিত রহস্য সিরিজ

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

আফগানিস্তান থেকে আবার শুরু হয়েছে আধুনিক ক্রুসেড। কিন্তু এ ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে এর স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে।

✖ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ✖ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমান্ডো অভিযান ✖ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ✖ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ✖ ভয়াল রজনী ✖ আবারো সংঘাত ✖ দুর্গ পতন ✖ ফেরাউনের গুপ্তধন ✖ উপকূলে সংঘর্ষ ✖ সর্প কেল্লার খুনী ✖ চারদিকে চক্রান্ত ✖ গোপন বিদ্রোহী ✖ পাপের ফল

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পুনর্জাগরণ। চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন, হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র। মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে। কিন্তু চীনের অবস্থা? ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই? চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না? চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না। আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী। **তাওহীদুল ইসলাম বাবু** চীনের মুক্তিপাগল মানুষের মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন এক নতুন রহস্য সিরিজ– **'অপারেশন'**।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের চারটি বই

✖ আতংকিত নানকিং ✖ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ✖ ব্ল্যাক আর্মির কবলে ✖ হাইনান দ্বীপে অভিযান

ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত রোদের তীব্রতা ছড়িয়ে সূর্য উঠল ক্রাক দুর্গের চারপাশে। মরুভূমির বালুতে ছড়িয়ে পড়ল প্রচণ্ড উত্তাপ। সংকল্পে অটল উভয় বাহিনী। খৃস্টানরা শপথ নিয়েছে মেরীর নামে, এবার আইয়ুবীকে তারা কিছুতেই রেহাই দেবে না, জীবন নিয়ে ফিরতে দেবে না আইয়ুবীর একজন সৈনিককেও। সংকল্পে অটল সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীও। তাঁর শপথ; যে কোন মূল্যে ক্রাক দুর্গ সে দখল করবেই। ক্রাকের মুসলমানদের ওপর যে জুলুম করা হচ্ছে তার অবসান ঘটাতে না পারলে তাঁর আত্মা কিছুতেই শান্তি পাবে না।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খৃস্টানদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ক্রাকের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। তীব্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্গ রক্ষীদের ওপর। তাঁর ক্ষীপ্রতা ও দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল খৃস্টান সৈন্যরা। সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের তীর প্রাচীর রক্ষীদের গায়ে আঘাত হানার আগ পর্যন্ত খৃস্টানরা বুঝতেই পারল না, তারা আক্রান্ত হয়েছে।

গোয়েন্দা বিভাগ সুলতান আইয়ুবীকে আশ্বাস দিয়েছিল, তিনি দুর্গে আঘাত হানলে ক্রাক শহরের মুসলমানরা ভেতর থেকে সহায়তা দেবে তাদের। সুলতান আইয়ুবীর যে সব

কমাণ্ডো আগেই শহরে প্রবেশ করেছিল, তারাও ভেতর থেকে দুর্গের দেয়াল ভেঙে সুলতানের অভিযানকে সফল করতে সহায়তা দেবে।

ক্রমাগত চারদিন বিরতিহীন লড়াই চললো উভয় পক্ষে। জয়-পরাজয় এখনো অনিশ্চিত। সুলতান যত তীব্র থেকে তীব্রতর করছে আঘাত, প্রতিরোধও ততই তীব্র হচ্ছে।

অবরোধের পঞ্চম দিন। গোয়েন্দা এসে সুলতান আইয়ুবীকে সংবাদ দিল, 'কয়েকজন মুসলমান ভেতর থেকে শহরের দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আফসোস! সফল হওয়ার আগেই তারা সবাই শহীদ হয়ে গেছে। এদের মধ্যে কয়েকজন মেয়েও ছিল। সবচে অবাক ব্যাপার হচ্ছে, এদের মধ্যে একজন খৃস্টান মেয়েও ছিল। গোয়েন্দা আরও জানালো, তাদের এ বিপর্যয়ের মূল কারণ ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। এ দলের মধ্যে একজন মুসলমান খৃস্টানদের গুপ্তচর ছিল। সে এ অভিযানের সংবাদ খৃস্টানদের জানিয়ে দেয়ার ফলেই শত্রুরা গোপনে ওঁৎ পাতার সুযোগ পায় এবং দলটি দেয়ালের কাছে পৌঁছলে অতর্কিতে তাদের ঘেরাও করে ফেলে। মুজাহিদরা প্রাণপণ মোকাবেলা করে একে একে সকলেই শহীদ হয়ে যায়, কিন্তু কেউ ময়দান ছাড়েনি। তাদের অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর খৃস্টানরা আরো সতর্ক হয়ে যায় এবং শহরের প্রতিটি গলিতে গোয়েন্দা লাগিয়ে দেয় যাতে মুসলমানদের যে কোন তৎপরতা সম্পর্কে তারা জানতে পারে। ফলে এখন ভেতর থেকে দেয়াল ভাঙার আশা করা বৃথা।'

এ খবরে মুসলমানদের আশা নৈরাশ্যে রূপান্তরিত হওয়ার

উপক্রম হল। ঘটনা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকলো না। খৃস্টানরা যখন মুসলমান যুবক ও যুবতীদের লাশগুলো সনাক্ত করতে পারল তখন তারা বুঝতে পারলো, মুসলমান যুবক ও যুবতীরা জীবন বাজি রেখে আইয়ুবীকে মদদ দিতে এক পায়ে খাড়া। তারা তখন মুসলমানদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালালো। মুসলিম যুবক-যুবতীদের এলোপাথারি ধরপাকড় শুরু করলো। ধরপাকড়ের সময় তারা মেয়েদেরকেও রেহাই দিল না। কেবলমাত্র বুড়োদেরকেই তারা নিজেদের ঘরে থাকার সুযোগ দিল। যুবকদেরকে ধরে এনে পাঠাল বেগার ক্যাম্পে আর যুবতীদেরকে দুর্গের সেনা ব্যারাকে নিয়ে বন্দী করে রাখলো। এই মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করে সম্ভ্রম বাঁচালো, বাকীরা শিকার হলো সৈনিকদের অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী গোয়েন্দার রিপোর্ট মনযোগ দিয়ে শোনলেন। দুঃখ ও বেদনায় হাহাকার করে উঠলো তার হৃদয়। মুসলমানদের এমন কঠিন মূল্য ও কুরবানীর জন্য তাঁর নিজেকেই দায়ী বলে মনে হলো। মনে হলো, সে যদি এ অভিযান শুরু না করতো তবে শহরের মুসলমানদের এখুনি এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না।

নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের আত্মত্যাগের এ কাহিনী শুনে তিনি মনে মনে বললেন, এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পেরেছে কেবল একজন মুসলমানের গাদ্দারীর কারণে। একজন গাদ্দার মুসলিম মুজাহিদদের এত বড় একটি দলকে অবলীলায় ধ্বংস করে দিল। তিনি আফসোস করে বললেন, মুসলমানদের মধ্যে সবসময় এমন কিছু লোক থাকে যারা আল্লাহর পথে জীবন

কুরবানী করে জীবনকে সফল করতে চায়। আবার কিছু মুসলমান এমনও থাকে যারা আল্লাহর ওপর তাদের যে ঈমান আছে সেই ঈমানকে কাফেরের পদতলে বিসর্জন দিয়ে জীবনকে বরবাদ করে দেয়। স্বার্থের ফাঁদে আটকে পড়ে তারা ইসলামের ক্ষতি করতে চায়। এই গাদ্দাররাই ইসলামের ইতিহাসের সবচে বড় দুশমন।

গাদ্দারদের কথা মনে হতেই সুলতান আইয়ুবীর চেহারায় ফুটে উঠল সীমাহীন ক্রোধের আগুন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নিজের মুষ্ঠিবদ্ধ হাত দিয়ে অন্য হাতে আঘাত করে বললেন, 'যে কোন মূল্যে অনতিবিলম্বে ক্রাক দখল করতে হবে। আমি সেইসব গাদ্দারদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে চাই, যাদের গাদ্দারীর কারণে জাতি বার বার জিল্লতির গর্তে পড়ে যায়।'

সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা সংস্থার অফিসার জাহেদান তাবুতে প্রবেশ করলো। সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আজ রাতেই আমি চূড়ান্ত আঘাত হানতে চাই। ক্রাকের পিছন দিকের কোন্ অংশ সবচে দুর্বল আমার জানা দরকার। এ ব্যাপারে তোমার পরামর্শ কি?'

'যে কোন পদক্ষেপের একটা অর্থ থাকা দরকার।' জাহেদান বললো, 'চূড়ান্ত আঘাত হানার সময় এখনো আসেনি বলেই আমি মনে করি। সম্ভবত আরো কিছু দিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

'কেন, কেন এমনটি মনে হচ্ছে তোমার! তুমি কি কোন নতুন খবর পেয়েছ?' সুলতান আইয়ুবীর প্রশ্ন।

'আপনি যে সফলতার আশা নিয়ে শত্রুদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিলেন তাতে আপনি পুরোপুরি সফল হতে পারেননি। শত্রুরা এখনো যথেষ্ট মজবুত। চূড়ান্ত হামলার আগে তাদের মানসিকভাবে আঘাত করা দরকার।'

জাহেদান কথা বলছিল নির্ভীকচিত্তে। সুলতান আইয়ুবী তাঁর সমস্ত অধস্তনদের বলে রেখেছিলেন, তারা যেন তাকে বাদশাহ মনে করে কুর্নিশ না জানায়। কখনও কোন পরামর্শ দিতে চাইলে বীরত্বের সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়েই দেয়। আর সমালোচনার কিছু থাকলে তাও যেন তারা খোলাখুলি বলে ফেলে। জাহেদান সেই নির্দেশ অনুসারেই সাহসিকতার সাথে তার অভিমত ব্যক্ত করল।

জাহেদান গোয়েন্দা বিভাগের উর্ধতন অফিসার। তাদের চোখ-কান সর্বদা সজাগ সতর্ক থাকে। গোয়েন্দাদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, তারা অন্ধকারেও দেখতে পায় এবং দূরবর্তী শত্রুর কানাঘুষা শুনতে পায়।

সুলতান আইয়ুবী গোয়েন্দাদের মতামতের যথেষ্ট মূল্য দিতেন। তিনি জানতেন, গোয়েন্দাদের রিপোর্ট ছাড়া কোন যুদ্ধেই বিজয় অর্জন করা যায় না। আর যে সময় খৃস্টানরা মুসলিম রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরে গোয়েন্দাদের জালের মত ছড়িয়ে রেখেছে সে সময় গোয়েন্দাদের প্রয়োজন তো আরো অনেক বেশি। সুলতান আইয়ুবীর এখন প্রয়োজন অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও পরীক্ষিত গোয়েন্দা। এ বিষয়টি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন দক্ষ ও বিশ্বস্ত এক বিশাল গোয়েন্দা বাহিনী। এ ব্যাপারে তিনি পূর্ণ

সফলতা লাভ করেছিলেন।

এ বাহিনীর অধিনায়ক আলী বিন সুফিয়ান ও তার দুই বিচক্ষণ সহকারী হাসান বিন আব্দুল্লাহ ও জাহেদানের মতামতকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তাদের তৎপরতা ও সুচিন্তিত পরামর্শের ফলেই তিনি খৃস্টানদের অনেকগুলো আঘাত ব্যর্থ করে দিতে পেরেছেন।

গোয়েন্দাদের তৎপরতার ফলেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, খৃস্টানরা ক্রাকের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার সাথে সাথে দুর্গের বাইরে মরুভূমিতে অনেক সৈন্য লুকিয়ে রেখেছে। মুসলমানরা চূড়ান্ত আঘাত হানার সাথে সাথে ওরা পেছন থেকে এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জাহেদান বললো, 'মরুভূমি ও পাহাড়ের খাঁজে লুকিয়ে থাকা খৃস্টান সৈন্যদের উপস্থিতিই প্রমাণ করে খৃস্টানরা এবার কেল্লার বাইরে যুদ্ধ করতে চায়। তাদের কোন ব্যবস্থা না করেই কেল্লা অবরোধ করায় শত্রুরা যথেষ্ট লাভবান হয়ে গেল।'

'তারা কি এরই মধ্যে আমাদের কোন বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে বসেছে?' সুলতান সালাহউদ্দিন অস্থির হয়ে প্রশ্ন করেন।

'না এখনো করেনি। তবে তাদের তৎপরতা দেখে বুঝতে পারছি, তারা আমাদের দুর্বল অংশে আঘাত করার জন্য আজ সন্ধ্যা নাগাদ রওনা হয়ে যাবে।' জাহেদান উত্তর দিল, 'খবর পেয়েছি, খৃস্টান অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহীরা থাকবে এ

অভিযানে। পদাতিক বাহিনীকে তারা খুব কম ব্যবহার করবে। তারা আমাদের ডান ও বাম দিক থেকে আক্রমণ চালাবে। খৃস্টানদের এক বিশাল বাহিনী এ অভিযানে অংশ নিচ্ছে। অসম্ভব নয়, এতে আমাদের অবরোধ ভেঙে যাবে।'

'আমি তোমাকে ও তোমার গোয়েন্দা বিভাগকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা এই সংবাদ নিয়ে এসেছে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি জানি আমি যে পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি তা বড় কঠিন ও ভয়াবহ। তবু আমি তোমাদের সকলকে আশ্বাস দিচ্ছি, খৃস্টান সৈন্যরা আমাদের যে শূন্য স্থান পূরণ করতে ও অবরোধ ভাঙতে আসছে, আমি তাদেরকে সেই শূন্য স্থানেই নির্মূল করে দেব। আল্লাহ আমাদের নেগাহবান। যদি তোমাদের মাঝে কোন গাদ্দার না থাকে তবে আল্লাহ তোমাদেরকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন।'

একজন সালার বললেন, 'যদি আপনি আদেশ দেন তবে আমাদের সংরক্ষিত সৈন্যদের একটি বাহিনী খৃস্টানদের পৌঁছার পূর্বেই সেখানে পাঠিয়ে দেই। তাহলে অবরোধের শূন্য স্থান পূরণ হয়ে যাবে এবং খৃস্টানদের আক্রমণ ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।'

সুলতান আইয়ুবীর মুখে কোন অস্থিরতা ও দুর্ভাবনার সামান্যতম ভাবও প্রকাশ পাচ্ছিল না। তিনি জাহেদানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার রিপোর্ট সম্পূর্ণ সত্যি হলে তুমি কি আমাকে আরো কিছু তথ্য দিতে পারবে? তুমি কি বলতে পারবে খৃস্টান সৈন্যরা কোন সময় আক্রমণস্থলে পৌঁছবে?'

'এরই মধ্যে তারা তাদের গোপন আস্তানা গুটিয়ে রওনা

হয়ে গেছে। তাদের অগ্রাভিযান খুবই দ্রুত।' জাহেদান উত্তরে আরো বলল, 'তাদের সাথে কোন তাবু বা খাদ্যশস্য আসছে না, তা পরে আসবে। মনে হয় তারা রাস্তায় কোথাও বিশ্রাম নেবে না। যদি তারা এ গতিতে আসতে থাকে তবে তারা মধ্য রাতের সামান্য আগে বা পরে এসে পৌঁছে যাবে।'

'আল্লাহ করুক তারা যেন রাস্তায় কোথাও না থামে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তারা তো ক্লান্ত, অভুক্ত ও পিপাসার্ত ঘোড়া ও উট নিয়ে যুদ্ধ করবে না। সমরাঙ্গণে এসে পশুগুলোকে বিশ্রাম ও খাবার দেবে। সেই সুযোগে তারা দেখতে পাবে, আমরা যে অবরোধ করে রেখেছি তার মাঝে কোথাও কোন ফাঁক আছে কি না।'

সুলতান আইয়ুবী সালারদের বললেন, 'খৃস্টানরা আমাদের ফাঁদে পড়তে আসছে।'

তিনি নির্দেশ দিলেন, 'কেল্লার পেছন দিকে আমরা অবরোধের যে ফাঁক রেখেছি সে স্থান আরও ফাঁকা করে দাও। দু'পাশে ডান ও বামের বাহিনীকে জানিয়ে দাও, তাদের ওপর পিছন থেকে আক্রমণ আসছে। তারা যেন তাদের বাহিনীকে আরও দৃঢ় ও সতর্ক করে নেয় এবং শত্রুদেরকে যেন মাঝখানে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়। আর কোন তীরন্দাজ যেন আমার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তীর না চালায়।'

এরপর সুলতান রিজার্ভ পদাতিক, অশ্বারোহী ও তীরন্দাজদের কয়েকটি দলে ভাগ করলেন। তাদের নির্দেশ দিলেন, 'সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে তোমরা অবরোধের দুর্বল স্থানের যতটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, কিন্তু

নিজেদের অবস্থান যেন দুশমন টের না পায়। তোমরা লক্ষ্য করেছো, যেখানে আমরা অবরোধ দুর্বল রেখেছি সে এলাকাটা সমান ময়দানও নয়, মরুভূমির মত বালুকা প্রান্তরও নয়। সে অঞ্চল টিলা, উপত্যকা ও গিরিখাদে পরিপূর্ণ। সহজেই তোমরা সেখানে আত্মগোপন করতে পারবে।'

সুলতান আইয়ুবী টহল গ্রুপের কমাণ্ডারকে ডাকলেন। বললেন, 'খৃস্টান বাহিনীর পিছনে যে খাদ্যদ্রব্য ও রসদপত্র আসছে তা রাতেই রাস্তায় লুট করতে হবে।' তিনি তাকে আরও কিছু জরুরী আদেশ দিয়ে তাবু থেকে বেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। সঙ্গে নিলেন কয়েকজন সালারকে। চললেন রণক্ষেত্রের দিকে।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আত্মতুষ্টিতে বিভোর হওয়ার মত লোক ছিলেন না। তিনি সমস্ত পরিকল্পনা আবার খতিয়ে দেখলেন এবং অবরোধকে কেল্লার কাছ থেকে আরেকটু দূরে সরিয়ে নিতে বললেন। তিনি যুদ্ধরত অফিসারদের বললেন, 'খৃস্টানদের অধিকার থেকে দুর্গ মুক্ত করা সহজ নয়। প্রয়োজনে দীর্ঘদিন ধরে অবরোধ টিকিয়ে রাখতে হবে।'

তিনি দেখলেন, দুর্গের প্রাচীরের ওপর থেকে বৃষ্টির মত তীর বর্ষণ করছে খৃস্টানরা। এ তীর বৃষ্টি ভেদ করে কেল্লার দরোজা পর্যন্ত পৌছা অসম্ভব। তিনি মুসলিম বাহিনীকে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে বললেন। কারণ, এ তীরের মোকাবেলায় পাল্টা আক্রমণ করার কোন যুক্তি ছিল না।

সুলতান আইয়ুবী কেল্লার প্রধান ফটকের লড়াইয়ের

অবস্থা দেখতে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। প্রচণ্ড উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল ফটকের মুজাহিদরা। একদল মুজাহিদ তখন বিপুল বিক্রমে দ্রুত কেল্লার প্রাচীরের ওপরে তীর বর্ষণ করে যাচ্ছিল। ছয়টি মেনজানিক আগুন ছুঁড়ে মারছিল প্রাচীরের ওপর। দেয়ালের ওপরে যেখানে তীর ও অগ্নি বর্ষণ হচ্ছিল সেখানে কোন খৃস্টান সৈন্য দেখা যাচ্ছিল না। দেয়াল ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। সুলতান আইয়ুবী দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন এসব।

তাঁর প্রায় চল্লিশজন সৈন্য হাতে বর্শা ও কোদালি নিয়ে দেয়ালের দিকে দ্রুত ছুটে গেল এবং দেয়ালের পাশে গিয়ে পৌঁছলো। কেল্লার প্রাচীর মাটি ও পাথরের গাথুনী দিয়ে তৈরী। তারা দেয়াল ভাঙা শুরু করলো। তাদের নিরাপদ রাখার জন্য কেল্লার ওপরে তীর ও অগ্নিবর্ষণ অব্যাহত রাখলো মুজাহিদরা, যাতে কেল্লার ওপর উঠে শত্রুরা তীর বর্ষণ করতে না পারে এবং কেল্লার দেয়াল ভাঙায় বাঁধা সৃষ্টি না হয়।

মুজাহিদদের এই সাহস ও তৎপরতা দেখে সুলতান আইয়ুবী বলে উঠলেন, 'সাবাস! সাবাস মুজাহিদ!'

সহসা দুর্গের প্রাচীরের ওপর চিৎকার শোনা গেল। সুলতানের চোখ সেই স্থানে নিবদ্ধ হলো, যেখানে আইয়ুবীর নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদরা দেয়াল ভাঙছিল। তিনি দেখলেন, অসংখ্য খৃস্টান সৈন্যের মাথা ও কাঁধ দেখা যাচ্ছে। তাদের হাতে বড় বড় বালতি ও ড্রাম। তীর বৃষ্টির ফাঁক গলে তারা প্রাচীরের ওপর উঠে এল এবং বালতি ও ড্রামে কাঠ ভিজিয়ে তাতে আগুন দিয়ে তা ছুঁড়ে মারতে লাগল নিচে। প্রজ্জ্বলিত

কাঠ ও জ্বলন্ত অঙ্গার সেইসব মুজাহিদের ওপর গিয়ে পড়ছিল, যারা নিচে দেয়াল ভাঙছিল। মুজাহিদরা আরো এগিয়ে গিয়ে তীর বর্ষণ শুরু করলে অসংখ্য খৃস্টান আহত হলো সে তীরের আঘাতে। দেয়ালের ওপর থেকে ছুটে আসা তীরে মুজাহিদদের তীরন্দাজ বাহিনীর কিছু লোকও আহত এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

শেষে উভয় দিক থেকে এমনভাবে তীর বর্ষণ হতে লাগলো, যেন বাতাসে তীরের জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে। জানবাজ মুজাহিদ খনও দেয়াল ভাঙছিল।

দেয়াল ভাঙা কোন হজ ব্যাপার ছিল না। কারণ কেল্লার দেয়াল যেমন চওড়া তেমনি মজবুত। এদিকে দেয়ালের ওপর থেকে এই জানবাজদের ওপরে তীর বর্ষণ করা সম্ভব ছিল না বলে তাদের ওপরে জ্বলন্ত কাঠ বর্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু এই কাঠ বর্ষণের কাজও সহজ ছিল না। যারাই এগিয়ে আসতো এ কাজে তারাই মুসলিম তীরন্দাজদের তীরের নিশানায় পরিণত হতো।

ওপরে যখন প্রবল তীর বৃষ্টি হচ্ছিল তখনও নিচে প্রজ্জ্বলিত আগুন এড়িয়ে দেয়াল ভাঙায় অটল ছিল মুজাহিদরা। কিন্তু আগুন যখন তাদের ঘিরে ধরল তখন আর সেখানে টিকতে পারল না। মুজাহিদদের অনেকেই এর মাঝে অগ্নিদগ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করলেন। বাকীরা দৌড়ে ফিরে এলো মূল বাহিনীর কাছে। অনেকের কাপড়ে আগুন লেগে গিয়েছিল, পথের মাঝে মুখ থুবরে পড়ে গেল তাদের কেউ কেউ। কেউবা ফিরতে গিয়ে দুশমনের তীরের আঘাতে লুটিয়ে পড়লো

মাঝপথে। বলতে গেলে এভাবে মুজাহিদদের প্রায় সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন।

পাঁচিলের ওপরে পরিখা থাকায় খৃস্টানরা বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। মুসলিম বাহিনী সামান্য পিছিয়ে খৃস্টানদের তীরের আওতার বাইরে চলে এল।

লড়াই চলছিল মূল ফটককে কেন্দ্র করে। খৃস্টান বাহিনীর দৃষ্টি মুসলমানদের মূল বাহিনীর দিকে, মুসলমানরা তাকিয়েছিল খৃস্টানদের দিকে। হঠাৎ মুসলমানরা দেখতে পেল ফটকের অনেক দূর থেকে দশজন মুজাহিদ দেয়াল ঘেঁষে শত্রুদের দৃষ্টি এড়িয়ে ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে। শত্রুর দৃষ্টি যাতে তাদের দিকে না পড়তে পারে সে জন্য মুসলমানরা আবার এগিয়ে এল এবং পুনরায় পূর্ণ উদ্যমে তীর বৃষ্টি শুরু করল। দশজনের মুজাহিদ দলটি এই সুযোগে দেয়ালের সাথে সেঁটে গিয়ে দ্রুত ফটকের পাশে পৌঁছে গেল। ওখানে পৌঁছে তারা দ্রুত দেয়ালের পাথর খুলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা অনেকগুলো পাথর খুলে দেয়ালের গায়ে বেশ বড় রকমের একটি গর্ত তৈরী করে ফেললো।

খৃস্টানরা টের পেয়ে আবার আগুনের গোলা ছুঁড়তে শুরু করল নিচে। কিন্তু এবার সে সব গোলা মুজাহিদদের তেমন ক্ষতি করতে পারল না। কারণ বিপদ দেখলেই ওরা দেয়ালের গর্তে সেঁধিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল। দু'জন অগ্নি নিক্ষেপকারী ড্রামের আড়াল নিয়ে ঝুঁকে মুজাহিদদের দিকে আগুনের মশাল নিক্ষেপ করতে চাইল, অকস্মাৎ মুসলিম বাহিনীর তীর এসে বিদ্ধ করল তাদের। খৃস্টান সৈন্য দু'জন

বুকে তীরের আঘাত খেয়ে পিছনে পড়ার পরিবর্তে দেয়াল থেকে ছিটকে সামনের দিকে পড়ল। তাদের শরীরের বাড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল ড্রামটি এবং মুহূর্তে আগুনের স্তূপে পরিণত হলো আশপাশের পুরো এলাকা। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য দুজন সেই অগ্নিকুণ্ডে পড়ে ভস্ম হয়ে গেল, সেই সাথে মুজাহিদ দশজনও হারিয়ে গেল সেই বিশাল অগ্নিকুণ্ডে।

সুলতান আইয়ুবী ঘোড়া হাকিয়ে দ্রুত কমাণ্ডারের কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের ওপরে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। ইসলামের ইতিহাস এইসব জানবাজদের নাম সবসময় স্মরণ করবে যারা আল্লাহর নামে অগ্নিকুণ্ডে ঝাপিয়ে পড়তেও পিছপা হয়নি। এখন তোমরা এ পথ ছেড়ে দাও এবং পিছু সরে আসো। এত তাড়াতাড়ি তীর ও সৈনিক নিঃশেষ করবে না। খৃস্টানরা এই কেল্লার জন্য এত বেশি আত্মত্যাগ করছে যার কোন ধারণাই আমরা করতে পারি না। আমরাও এত বেশি কুরবানী দিব যার ধারণা খৃস্টানদের কাছে নেই।'

কমাণ্ডার বললো, 'আরেকটু চেষ্টা করলেই এখান দিয়ে দেয়াল ভাঙা যাবে, আর আমরা এই পথে আপনাকে কেল্লার ভেতরে নিয়ে যেতে পারবো।'

'আল্লাহ তোমার আশা পূরণ করুন।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তোমার মুজাহিদদেরকে বাঁচিয়ে রাখো। খৃস্টানরা এখন বাইরে থেকে আক্রমণ চালাবে। তোমাকে সম্ভবত বাইরেও যুদ্ধ করতে হবে। অবরোধ সুদৃঢ় রাখো। চোখ-কান খোলা রেখে খানিক জিরিয়ে নাও, আমরা খৃস্টানদের এবার ক্ষুধা-তৃষ্ণার সাথে লড়াই করতে পাঠাবো।'

সৈন্যদলকে পিছনে সরিয়ে আনলেন কমাণ্ডার। কমাণ্ডার সুলতান আইয়ুবীকে বললো, 'আপনার অনুমতি পেলে আমি শহীদদের লাশগুলো উঠিয়ে আনতে চাই।'

'হ্যাঁ!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'নিয়ে এসো। কোন শহীদের লাশ যেন বাইরে পড়ে না থাকে।'

সুলতান আইয়ুবী চলে এলেন ওখান থেকে। এই জানবাজ সৈন্যরা যেভাবে তাদের বন্ধুদের লাশগুলো উঠিয়ে আনলো, সেও এক কল্পনাতীত দৃশ্য। বন্ধুদের লাশ উঠাতে গিয়ে শাহাদাতের নজরানা পেশ করলো আরো কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ।

সুলতান আইয়ুবী অনেক দূর চলে গিয়েছিলেন। তিনি এমনভাবে চলাফেরা করলেন যাতে শত্রুরা বুঝতে না পারে তিনি কোথায় আছেন। তিনি তাঁর বাহিনী থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। একাধিক টিলা, উঁচু প্রান্তর ও গিরিপথ পার হয়ে তিনি এক টিলার ওপর ঘোড়া থেকে নামলেন এবং সাবধানে শুয়ে পড়লেন যাতে শত্রুরা তাকে দেখতে না পায়। টিলার ওপর থেকে তিনি কেল্লা ও শহর দেখতে পাচ্ছিলেন। অন্যদিকে প্রায় মাইলখানেক বিস্তৃত অঞ্চল নজরে ভাসছিল তাঁর। তিনি সাবধানে টিলার প্রতিটি এলাকা গভীরভাবে লক্ষ্য করলেন এবং ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখলেন।

এই গভীর পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করতে করতে সূর্য ডুবে গেল। তিনি সেখানেই অবস্থান করতে থাকলেন। সন্ধ্যার একটু পর তাঁকে সংবাদ দেয়া হলো, নির্দেশ মোতাবেক তীরন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী আসছে। তিনি গুপ্তচরকে

বললেন, 'বাহিনীকে সাবধানে আত্মগোপন করতে বলো আর কমাণ্ডারদেরকে বলো আমার সাথে অবিলম্বে দেখা করতে।'

বিভিন্ন গ্রুপের কমাণ্ডাররা বাহিনীকে লুকিয়ে রেখে দেখা করলো এসে সুলতানের সাথে। সুলতান আইয়ুবী পথ-নির্দেশ দিয়ে তাদেরকে নিজ নিজ বাহিনীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রাত ক্রমে বাড়তে থাকলো। মরুভূমিতে নেমে এল নিশুতি প্রহর। চারদিকে সুনসান নীরবতা। মাঝ রাতের দিকে এই নিস্তব্ধ নীরবতা ছাপিয়ে দূর থেকে ভেসে এল সম্মিলিত অশ্বখুরের মৃদু কিন্তু বলিষ্ঠ শব্দ। উন্মাতাল প্লাবন কোন বাঁধ ভেঙে ছুটে আসতে শুরু করলে যেমন শব্দ হয় অনেকটা সে রকম। শব্দ ক্রমে জোরালো হতে থাকল।

সুলতান সে শব্দের উৎসের দিকে তাকিয়েছিলেন অপলক নেত্রে। আকাশে ছিল ভরা পূর্ণিমার চাঁদ। নরম জোসনায় ব্যপ্ত ছিল সমগ্র চরাচর। অনেকক্ষণ ধরে সুলতান শুনছেন সম্মিলিত অশ্ব খুরধ্বনি। অস্পষ্টতা থেকে সে শব্দ একসময় স্পষ্ট হলো। স্পষ্ট শব্দ ক্রমে আরো জোরালো হলো, কিন্তু এই ফকফকা জোসনায়ও কোন বাহিনী নজরে এল না তাঁর। তিনি নিবিষ্ট মনে তাকিয়েছিলেন উন্মুক্ত মরুভূমির দিকে। বুঝতে পারছিলেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসা বাহিনী তাঁর দৃষ্টিসীমায় আঘাত হানবে।

অবশেষে একসময় তাঁর অন্তহীন প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। দূর দিগন্তে চলন্ত রেখা ফুটে উঠলো। ক্রমে সে রেখা বড় হতে থাকলো। একসময় খৃস্টান বাহিনীর অশ্বারোহী দলটি

টিলা ও উচ্চভূমি অঞ্চল পেরিয়ে এল। তাদের পিছনে এল উষ্ট্রারোহী দলও। এদের সৈন্য সংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন তিন হাজারের কম। তবে সে সময়ের ঘটনা প্রবাহের যা বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দশ থেকে বারো হাজারের মত বলে উল্লেখ করেছেন অধিকাংশ ঐতিহাসিক।

বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন প্রসিদ্ধ খৃস্টান সম্রাট রিমাণ্ড। সে এই আক্রমণের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে পাহাড়ের আড়ালে তাবু টানিয়ে অপেক্ষা করছিল। তার পরিকল্পনা ছিল ভোর রাতে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর বাহিনীর ওপর সে অতর্কিত আক্রমণ চালাবে। কচুকাটা করবে আইয়ুবীর ঘুমন্ত প্রতিটি সৈনিককে। বার বার আইয়ুবী খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল, এবার তার প্রতিশোধ নেবে রিমাণ্ড। চিরতরে মিটিয়ে দেবে আইয়ুবীর যুদ্ধের সাধ।

খৃস্টান সৈন্যরা ঘোড়া ও উটের পিঠ থেকে নেমে এলো নিচে। ঘোড়ার সাথে বাঁধা ঘোড়ার আহার্য দানার ব্যাগ ঘোড়ার সামনে ঝুলিয়ে দিল। আরোহীদের আদেশ দেয়া হলো সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে। রিমাণ্ড বললো, 'মা মেরীর সন্তানেরা, তোমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আজ পূরণ হতে চলেছে। খৃস্টান জাতির সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ তোমাদের মনোনীত করেছে। তোমরা মুসলমানদের ওপর আঘাত হানবে অতর্কিতে। ওরা এখন হাতিয়ার রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। তোমরা আক্রমণ চালাবে একদল নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মানুষের ওপর। ফলে তেমন কোন

মোকাবেলার সম্মুখীন তোমাদের হতে হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। আমি শুধু চাই, তোমরা এমন দ্রুত ও তীব্র আঘাত হানবে, যাতে দুশমন কোনরকম প্রতিরোধের সুযোগ না পায়।'

সুলতান আইয়ুবী এবং তাঁর পর্যবেক্ষকগণ খৃস্টান সৈন্যদলকে ভালভাবেই লক্ষ্য করছিল। এতবড় বাহিনী দেখে আইয়ুবী ঠিকই বুঝলো, খৃস্টানরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে।

ভোর রাত। আদম সুরাত হেলে পড়েছে আকাশের একদিকে। চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মধ্যরাতের উজ্জ্বল আলো এখন অনেকটা ম্রিয়মান। সারা রাত কুয়াশা ঝরে সে আলো আরো ফিকে করে দিয়েছে। মরা জোসনায় এখন আর সবকিছু আগের মত স্পষ্ট দেখাও যায় না।

সেই অস্পষ্ট আলোতেই সুলতান দেখলেন খৃস্টান বাহিনী তৎপর হয়ে উঠছে। ঢিলেঢালা ভাব কাটিয়ে ওরা তৈরী হচ্ছে যুদ্ধের জন্য। অশ্বারোহীরা চেপে বসছে ঘোড়ায়। ওদের হাতে বর্শা ও তলোয়ার। ওরা সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। রিমাণ্ড দেখলেন তার বাহিনী প্রস্তুত। বললেন, 'যিশুর সৈনিকরা, সামনে বাড়ো।'

নড়ে উঠলো বাহিনী। ঘোড়াগুলো পা তুললো সামনের দিকে, ঠিক এই সময় আইয়ুবী বললেন, 'তীর ছুঁড়ো।'

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো মুজাহিদদের তীর বর্ষণ। আইয়ুবীর হুকুম মত প্রথম পশলা গেল পিছন সারির ওপর দিয়ে। ঘোড়ার পিঠেই মুখ থুবড়ে পড়লো খৃস্টান সৈনিকদের সে

সারিটি। কিছু বুঝে উঠার আগেই ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল নিচে।

বিরতি ছাড়াই ছুটে এল দ্বিতীয় পশলা। আঘাত করল সওয়ারহীন ঘোড়াগুলোকে। গায়ে তীর বিদ্ধ হতেই লাগামহীন ঘোড়াগুলো ছুট লাগালো এদিক ওদিক। ডানে, বায়ে, সারির মাঝখান দিয়ে, যেদিক পারলো ছুটলো উর্ধশ্বাসে। বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়লো পুরো বাহিনী জুড়ে। বাহিনীর সামনে থেকে খৃস্টান কমাণ্ডার বুঝতেই পারলো না, ব্যাপারটা কি? কেন এত বিশৃংখলা?

সে রাগের মাথায় চিৎকার করে গালাগালি শুরু করে দিল। এর পরের আঘাতটা এল উটের বহরের ওপর। ঘোড়ার মতই উটগুলোও দৌড় লাগালো দিশেহারা হয়ে। ফলে মুহূর্তে সমস্ত সেনাবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ল সীমাহীন আতংক।

এরপর কখনো তীর ছুটে আসতে লাগলো ডান দিক থেকে, কখনো বাম দিক থেকে, কখনো পেছন থেকে। দলে দলে খৃস্টান ফৌজ তীরবিদ্ধ হতে লাগল। তাদের আর্ত চিৎকার প্রভাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে দিল। যখন ভোরের আলো ফুটে উঠল পাহাড় ও টিলার ফাঁক-ফোকরে তখন রিমাণ্ড পরিষ্কার বুঝতে পারল, খৃস্টান বাহিনী সুলতান আইয়ুবীর কঠিন বেষ্টনীর মধ্যে আটকা পড়ে গেছে।

সে জানতে পারল না, কি পরিমান মুসলমান সৈন্য এ অভিযানে অংশ নিয়েছে! তাদের সংখ্যা কি খুবই বেশি? তার মনে হলো, জীবনের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে তার। জীবনে অনেকবারই মুসলমানদের মুখোমুখি হয়েছে রিমাণ্ড,

কিন্তু এতটা অসহায় ও অনিশ্চয়তা আর কখনো তাকে গ্রাস করেনি। এ যেন এক অবধারিত মৃত্যু ফাঁদ। যে পথে সে এই গিরি অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল সে পথ আগলে রেখেছে মুজাহিদরা। ডানে-বায়ে পাহাড়ে টিলায় মুসলিম তিরন্দাজ বাহিনী। পাহাড় ও টিলার ফোঁকড় গলে সামনে বেরিয়ে যাবার যে সংকীর্ণ পথ, সে পথও মুজাহিদদের দখলে। খোলা ও সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে মুসলিম তীরন্দাজদের নিশানা হওয়া ছাড়া যেন এখন তাদের আর কিছুই করার নেই।

রিমাণ্ড যে পথে এসেছিল সে পথে ফিরে যাওয়ার জন্য একবার ছুটে গেল সেদিকে, কিন্তু মুজাহিদদের প্রচণ্ড আক্রমণে টিকতে না পেরে পিছু হটতে বাধ্য হলো। আবার চেষ্টা করলো সংকীর্ণ পথে সামনের দিকে বেরিয়ে যাওয়ার, কিন্তু তাড়া খেয়ে সেখান থেকেও ফিরে এল বাঘের মুখে পড়া ভয়ার্ত হরিণীর মত। ময়দানের মাঝখানে ছুটে এলেই পাহাড়, টিলার পাথর ও ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে আসতো ঝাঁক ঝাঁক তীর।

মুজাহিদদেরকে আগেই আইয়ুবী সবকিছু বুঝিয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'রিমাণ্ড আসছে বিপুল শক্তি নিয়ে এবং চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য। অতএব তাকে তোমাদের সেভাবেই অভ্যর্থনা জানাতে হবে।'

সুলতানের কথায় মুজাহিদরা এই আক্রমণকে সানন্দে গ্রহণ করার মানসিকতা নিয়েই প্রস্তুত হয়েছিল। ফলে রিমাণ্ডের বাহিনীর বিশালতা দেখে তারা মোটেও ঘাবড়ে যায়নি।

অবরোধকারী মুজাহিদরা এবার খৃস্টানদের সামনে

যাওয়ার পথ থেকে সরে গেল। বিজয়ের আশা ছেড়ে ওই পথে পালিয়ে যাওয়ার জন্য রিমাণ্ড ঘোড়া ছুটালো। পাথর ও ঝোপের আড়ালে বসে মুজাহিদরা যখন দেখলো ধূলির মেঘ তুলে খৃস্টানরা ছুটছে বেস্টনী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তখন তারা সংকেত পাঠালো বেস্টানীর বাইরের মুজাহিদদের কাছে। প্রস্তুত হয়েই ছিল মুজাহিদরা। ধূলার মেঘ নিয়ে যখন অশ্বারোহী দল সেই ফাঁক গলে পরবর্তী বেস্টনীতে বেরিয়ে এল, দু'পাশ থেকে মুজাহিদরা টুটে পড়ল তাদের ওপর। তারা কোথা দিয়ে কেমন করে আক্রান্ত হলো, এ কথা বুঝার আগেই চোখের পলকে বিপুল সংখ্যক খৃস্টান সৈন্য ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে। খৃস্টান সৈন্যরা অনুভব করলো, তারা খাঁচায় বন্দী শিকারের মতই অসহায়। এগুনোর পথ রুদ্ধ দেখে আবার পিছনে হটলো ওরা, চলে এল মাঠের ঠিক মধ্যিখানে।

সমতল এলাকাটি ছিল বেশ বড়সড়। মাঝখানের অনেকটা অংশ দু'পাশের পাহাড় থেকে মারা তীরের আওতার বাইরে থাকায় ওখানে আশ্রয় নিল ওরা।

সুলতান আইয়ুবী এই যুদ্ধের পরিচালনা ও তদারক নিজেই করছিলেন। সুলতান আইয়ুবীর কৌশল এবারও তাদেরকে ভয়, আতঙ্ক এবং নিরাশার অন্ধকারে ছুঁড়ে মারল। তারা যেদিকেই যায় দেখতে পায় সামনে বাঁধার পাহাড়। মধ্যিখানের ওই নিরাপদ অঞ্চলটুকু থেকে সামান্য এদিক ওদিক হলেই পাশ থেকে ছুটে আসতো ঝাঁক ঝাঁক তীর।

খৃস্টান সেনাপতি রিমাণ্ড তার বাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ে চড়ার নির্দেশ দিল।

হঠাৎ একযোগে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ওরা ছুটল পাহাড়ের দিকে। কিন্তু মুজাহিদদের তীর বৃষ্টি সব কটি দলকেই আবার ফেরত পাঠাল মাঠের মাঝখানে। সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডাররা তাঁর নির্দেশ অনুসারে সামনাসামনি যুদ্ধ করার কোন সুযোগই দিল না খৃস্টানদের।

বেলা গড়িয়ে চলল। রোদের উত্তাপ বাড়ল। সূর্য উঠে এল মাথার ওপর। খৃস্টানদের ঘোড়াগুলো ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। সৈনিকরা হয়ে পড়ল ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত। তারা চারণভূমি ও পানির সন্ধানে তৎপর হল। দুপুর পর্যন্ত কোন রসদ পৌঁছলো না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল রিমাণ্ড। কমাণ্ডারদের ডেকে বৈঠকে বসল। বলল, 'খাদ্য শস্য তো সকালেই এসে যাওয়ার কথা ছিল!'

কয়েকজন অশ্বারোহী রসদ নিয়ে আসা বাহিনীর খবর নেওয়ার জন্য বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মুসলমান তীরন্দাজদের হাতে মারা পড়ল। কিন্তু যদি তারা জীবিত বেরিয়েও যেতে পারতো, তবু কোনদিন আর তাদের রসদ সামগ্রী নিয়ে আসা বাহিনীর সাক্ষাৎ পেতো না তারা। কারণ রাতের অন্ধকারেই সুলতানের পাঠানো টহল বাহিনী পথিমধ্যে তাদের পাকড়াও করে। তাদের অভিযান ছিল খুবই সফল। রসদবাহী দলটিকে তারা সহজেই ঘায়েল করতে সক্ষম হয়। কাফেলার রক্ষীদের হত্যা করে রাতের অন্ধকারেই তারা খৃস্টানদের সমস্ত রসদপত্র কব্জা করে নিয়ে আসে মুজাহিদ শিবিরে।

দুপুরের একটু পর সুলতান আইয়ুবী তার সংরক্ষিত

সৈন্যদলকে ডেকে পাঠালেন এবং রিমাণ্ডের বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে রাখার নির্দেশ দিয়ে রাত থেকে যে বাহিনী যুদ্ধ করছিল তাদের নিয়ে তাবুতে ফিরে গেলেন।

যদি মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা খৃস্টানদের সমানও হতো তবু তিনি সামনাসামনি খৃস্টানদের আক্রমণ করে নিঃশেষ করে দিতেন তাদের। কিন্তু বাহিনীর স্বল্পতার জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ থেকে বিরত রইলেন সুলতান। তিনি মুজাহিদ বাহিনীর শক্তি ও সৈন্য অপচয় করতে চান না। তাই শত্রু সেনাদেরকে তিনি আতংকিত ও ব্যতিব্যস্ত রাখলেন ঠিকই কিন্তু তাদের জীবন বায়ু নিভিয়ে দেয়ার জন্য কোন বেপরোয়া পদক্ষেপ ও চূড়ান্ত যুদ্ধে জড়ালেন না। বরং বাঘ যেমন বাগে পাওয়া শিকার নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে থাকে তেমনি তিনিও ময়দানে দুশমনকে সম্পূর্ণ বেষ্টনীর মধ্যে রেখে টিলা ও পাহাড় অঞ্চলের ঝোপের আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে রইলেন। তিনি জানতেন, যতই সময় অতিবাহিত হবে খৃস্টানরা ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে যাবে।

কিন্তু খৃস্টানদের এভাবে অবরোধ করে রাখতে গিয়ে তাদের নিজেদেরও যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল। খৃস্টানদের বৃহৎ শক্তিকে বেঁধে রাখতে গিয়ে সুলতানও তার সমস্ত রিজার্ভ বাহিনীকে আটকে ফেলেছিলেন। এখন এসব সৈন্যদেরকে আর অন্য কোন কাজে ব্যবহার করার সুযোগ থাকল না।

সুলতান আইয়ুবী রিমাণ্ডের বাহিনীকে আটক করার পর তাবুতে ফিরে এসে মূল বাহিনীকে শহর অবরোধ আরো কঠোর ও জোরালো করার আদেশ দিলেন। খৃস্টানরা আর

বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ পেল না। প্রতিদিন কোন না কোন স্থানে মুজাহিদদের আক্রমণ হতেই থাকলো। এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগলো একেকটা দিন। সুলতান আইয়ুবী শহর ও কেল্লার চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। কোন স্থান থেকেই দেয়াল ভাঙার কোন সুযোগ দেখা যাচ্ছিল না।

অবরোধ করার পর ষোল দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় সুলতান নিজের তাবুতে বসে অফিসার ও সহকর্মীদের সাথে কথা বলছিলেন। আলোচনা হচ্ছিল কেল্লায় প্রবেশ করার কি উপায় বের করা যায় এই নিয়ে। সুলতানের এক দেহরক্ষী তাবুর ভেতরে প্রবেশ করে সংবাদ দিল, 'সুদান থেকে এক দূত এসেছে।'

আইয়ুবী বললেন, 'তাকে জলদি ভেতরে নিয়ে এসো।'

রক্ষী বেরিয়ে যেতেই সুলতান স্বগতোক্তি করে বললেন, 'আল্লাহ করুন যেন সংবাদ ভাল হয়।'

কাসেদ ভেতরে এলে সুলতান সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারলেন। সে কোন সংবাদ বাহক নয়, একটি সেনাদলের কমাণ্ডার! সুলতান আইয়ুবী অস্থির হয়ে বললেন, 'কি খবর, তুমি কি কোন সুসংবাদ বয়ে এনেছো?'

কমাণ্ডার না সূচক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললো, 'প্রধান সেনাপতি যে সুসংবাদ প্রত্যাশা করছেন তেমন কোন সুখবর এখনো আনতে পারিনি, কারণ সুদানে এখনও আমাদের বিজয় অর্জিত হয়নি। আবার এ কারণে সংবাদ খারাপও নয় যে, আমরা এখনও পরাজিত হইনি এবং পিছুও হটিনি।'

'তার মানে পরাজয় ও পিছু হটার আলামত দেখা যাচ্ছে, তাই না?' সুলতান প্রশ্ন করলেন।

'অনেকটা সে রকমই।' কমাণ্ডার উত্তরে বললো, 'এ অবস্থায় এখন আমরা কি করব এ ব্যাপারে আপনার আদেশ জানার জন্যই আমি এসেছি। আমাদের এখন সেনা সাহায্য ভীষণ প্রয়োজন। যদি আমাদের এই প্রয়োজন পূরণ না হয় তবে পিছু হটা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না আমাদের।'

সুলতান আইয়ুবী ময়দানের বিশদ বিবরণ শোনার আগেই তার জন্য খাবার আনালেন এবং বললেন, 'তুমি খেতে থাকো এবং খেতে খেতে ময়দানের খুঁটিনাটি সব আমাকে খুলে বলো।'

সুলতান আইয়ুবীর অনুপস্থিতিতে তাঁর ভাই তকিউদ্দিন মিশরের শাসক রূপে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি মিশর ও সুদানের সীমানার কাছে ফেরাউনের শাসনকালের কিছু ধ্বংসাবশেষের খবর পান। খৃস্টানরা তাকে বিভ্রান্ত করার জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নেয়। তারা প্রচার করে যে, 'এসব প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ দখল করার জন্য সুদান শিঘ্রই মিশর আক্রমণ করতে যাচ্ছে।'

এ গুজব শোনার পর তিনিই আগ বাড়িয়ে সুদান আক্রমণ করার সংকল্প ঘোষণা করলেন। তাঁর সেনাপতি ও উপদেষ্টাগণ তাকে তাঁর ভাই সুলতান আইয়ুবীর অনুমতি নিয়ে আক্রমণ করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু তকিউদ্দিন বললেন, 'ভাই এখন ক্রুসেডের বিশাল বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছেন, এ

অবস্থায় আমি তাঁকে বিরক্ত করতে চাই না।' এই বলে তিনি সুদানের ওপর আক্রমণ করে বসলেন।

তকিউদ্দিন আবেগের উন্মাদনায় আক্রমণ করে বসলেন ঠিকই কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য যে বিচক্ষণতা ও দক্ষতা থাকা দরকার তা তার ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, বিচক্ষণতা থাকলে তিনি এই অনাহুত যুদ্ধে জড়িয়েও পড়তেন না! যাই হোক, যখন তকিউদ্দিন দেখলেন যুদ্ধের অবস্থা সুবিধের নয় তখন তিনি এই কমাণ্ডারকে ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। একজন কাসেদ না পাঠিয়ে কমাণ্ডারকে পাঠানোর কারণ, সে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সবিশেষ বর্ণনা সুলতান আইয়ুবীর কাছে বুঝিয়ে বলতে পারবে।

সুলতান আইয়ুবী আগেই এ যুদ্ধের খবর পেয়েছিলেন। শুধু এতটুকু জানতে পেরেছিলেন, তকিউদ্দিন সুদানের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে।

কমাণ্ডার সুলতান আইয়ুবীকে শোনাল যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ। বললো, 'তকিউদ্দিন বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সুদান আক্রমণের আদেশ দিয়েছিলেন।'

সুলতান জানতেন, তকিউদ্দিনের চেতনা ও আবেগ সুলতান আইয়ুবীর থেকে ভিন্ন ছিল না, ভিন্ন ছিল দুই ভাইয়ের বিচার-বিবেচনা ও বিচক্ষণতা। তকিউদ্দিন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা সৎ উদ্দেশ্যে এবং ইসলামী প্রেরণা থেকেই নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করেছিলেন। নিজের গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট এবং উপদেষ্টাদের

মতামতের ওপর পূর্ণ গুরুত্ব ও খেয়াল দেননি।

তিনি শুধু সেই রিপোর্টের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, যাতে সুদানীদের ট্রেনিং নেওয়া এবং আক্রমণের প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে। তকিউদ্দিন শত্রুদেরকে প্রস্তুত হওয়ার আগেই বশীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু এর শেষ পরিণাম কি তা জানার চেষ্টা করেননি। সুদানীদের সামরিক শক্তি কেমন ও কত বেশি তাও খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করেননি তিনি। বুঝতে চেষ্টা করেননি, তারা যুদ্ধে কত শক্তি প্রয়োগ করবে এবং কত শক্তি রিজার্ভ রাখবে। তাদের কি পরিমাণ অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম আছে তারও খবর নেননি। জানতে চাননি তাদের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী কত? তার চেয়েও বড় কথা, ময়দানে কি ধরনের প্রতিরোধের মোকাবেলা তাকে করতে হবে সে কথা না জেনেই তিনি আক্রমণের হুকুম দিয়েছিলেন। এমনকি মিশরের রাজধানী থেকে সে অঞ্চল কত দূরে এবং কেমন করে সেখানে নিজেদের রসদপত্র পাঠাবেন এর কিছুই না ভেবেই তিনি এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

সুদানীরা তকিউদ্দিনের বাহিনীকে সীমান্তে কোন বাঁধা প্রদান করল না। তারা তাকে সুদান সীমান্ত থেকে অনেক দূর পর্যন্ত ভেতরে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিল। শেষে এমন এক স্থানে এনে ফেললো, যেখানে নিষ্ঠুর মরুভূমি তাদের মৃত্যুর জন্য ভয়াল ফাঁদ পেতে রেখেছে। যেখানে প্রাণের কোন অস্তিত্ব নেই, নেই এক ফোটা পানির ব্যবস্থা।

তকিউদ্দিনের বাহিনী প্রকৃতপক্ষে সুলতান সালাহউদ্দিন

আইয়ুবীর রণ কৌশল অনুযায়ী যুদ্ধ করার প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। তারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার এবং সংখ্যায় কম হয়েও শত্রুর বড় বড় বাহিনীকে তছনছ করে দেয়ার সামর্থ রাখতো। তবে এ জন্য কুশলী সেনানায়কের নেতৃত্বের প্রয়োজন। এ সৈন্যদলকে শুধুমাত্র সুলতান আইয়ুবীই কমাণ্ড ও ব্যবহার করতে পারতেন।

সুলতান আইয়ুবী সম্মুখ যুদ্ধের সংঘর্ষ সবসময় এড়িয়ে চলতেন। তিনি সৈনিকদের প্রস্তুত করেছিলেন কমাণ্ডো লড়াইয়ের উপযুক্ত করে। ক্ষিপ্রতা, গতিশীলতা ও অতর্কিতে আঘাত হান[illegible] এ বাহিনীর কোন জুড়ি ছিল না। কিন্তু তকিউদ্দিন কৌশলাবিহীন শুধু সৈন্য সমাবেশ করে যুদ্ধ করায় অভ্যস্ত ছিলেন। এই বাহিনীতে দক্ষ, পরীক্ষিত ও জানবাজ সৈন্য ছিল। কিন্তু তাদের সঠিক ব্যবহার করার নেতা একমাত্র সুলতান আইয়ুবীই ছিলেন।

সুদানে আক্রমণ করা মানে, সুলতান আইয়ুবীর এক বিরাট বাহিনীকে বেহুদা বন্দী করে রাখা। খৃস্টানরা এটাই চাচ্ছিল। আর এ জন্যই তারা এ রকম চাল চেলেছে। তকিউদ্দিনের বাহিনীকে কৌশলে সুদানের গভীর অভ্যন্তরে নিয়ে তাদের মনোপুত স্থানে কার্যত বন্দী করে রেখেছে। আর তাদের ওপর সুলতান আইয়ুবীর কৌশল অবলম্বন করে রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণ চালাচ্ছে। তকিউদ্দিন উট, ঘোড়া এবং সৈন্যদের জন্য এক ফোঁটা পানিও পাচ্ছে না কোথাও।

কমাণ্ডো বাহিনীর সালার অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে এক সময় বললো, 'আমাদেরকে আপনি মরুভূমিতে

স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিন। আমরা মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের মত সরে পড়বো। এরপর অতর্কিত হামলার মোকাবেলায় আমরাও ওদের ওপর অতর্কিত হামলা চালাবো এবং তাদের কাছ থেকেই ছিনিয়ে আনবো আমাদের খাদ্য ও পানীয়।'

কিন্তু তকিউদ্দিন এতে বাহিনী সংকোচিত হয়ে পড়বে বলে আশংকা করলেন। ভাবলেন, এতে কেন্দ্রীয় কমাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সম্মিলিত শক্তি দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে, তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং এ ধরনের চিন্তা মাথা থেকে বাদ দিতে বললেন তাকে।

যখন রসদপত্র বা খাদ্যশস্যের প্রশ্ন উঠে তখন তাদের মনে জেগে ওঠে অজানা শংকা। তারা বর্ডার থেকে এত দূরে চলে এসেছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও এখানে রসদ পৌঁছতে কয়েক দিন লেগে যাওয়ার কথা। আর এখন তো রাস্তায় রসদ বহর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ষোলআনা। যে কোন জায়গায়, যে কোন সময় আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আছে। এ আতংকজনক অবস্থায় পথ চলা নিরাপদ নয় বলেই বহরের প্রতিটি সৈনিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে।

কমাণ্ডো বাহিনীর এ আশংকা অচিরেই সত্য প্রমাণিত হলো। একদিন তারা খবর পেলো, তাদের খাদ্যশস্যবাহী বহর আক্রান্ত হয়েছে এবং শত্রুরা সমস্ত খাদ্যশস্য, রসদপত্র ও বাহনের জন্য নিয়ে আসা পশু লুট করে নিয়ে গেছে। এ ঘটনার পর কমাণ্ডো বাহিনীর প্রধান আবারো তাকিউদ্দিনের কাছে তার প্রস্তাব পেশ করল। কিন্তু তকিউদ্দিন সে প্রস্তাব তো গ্রাহ্যই

করলেন না বরং এ জন্য তাকে তিরস্কার করলেন। অনাকাঙ্খিত হলেও তকিউদ্দিনের সাথে তার বাকবিতণ্ডা হলো এবং তকিউদ্দিন তাকে কড়া ধমক লাগালেন।

কমাণ্ডার বললো, 'আমরা আপনার নৈতৃত্বে যুদ্ধ করতে এসেছি, যুদ্ধ করবো। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, শত্রুরা রাতের আঁধারে এসে আমাদের খাদ্যশস্য লুট করে নিয়ে যাবে আর আমরা তা চুপ করে দেখবো। লড়াইয়ের স্বার্থে আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে পারবো না।'

তকিউদ্দিন ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'তুমি সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছো। তোমার কাছ থেকে আমার যুদ্ধ করা শিখতে হবে না।'

কমাণ্ডার উত্তরে বললো, 'আমাকে মাফ করবেন, আপনি সুলতান তকিউদ্দিন, সুলতান সালাহউদ্দিন নন। আমরা যুদ্ধ করতে শিখেছি সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে নয়। সিপাহসালার হিসাবে তিনি আমাদেরকে যেভাবে যুদ্ধ করতে শিখিয়েছেন আমরা সে ভাবেই যুদ্ধ করতে চাই। সারা জীবন আমরা কমাণ্ডো ট্রেনিং পেয়েছি। আমরা শিখেছি কি করে শত্রুর পেটের মধ্যে ঢুকে তাদের পেট কেটে বেরিয়ে আসতে হয়। আপনার সৈন্যরা ক্ষুধায় মরছে আর তাদের খাবার ও রসদপত্র শত্রুরা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা শত্রুদের রসদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজের সৈন্যদের পেট ভরাতে অভ্যস্থ।'

তকিউদ্দিনের চোখে পানি এসে গেল। তিনি জানতেন কমাণ্ডার কি প্রেরণা ও আবেগ নিয়ে কথা বলছে। রাগের

পরিবর্তে তার মাঝেও এসে ভর করলো আবেগ। তিনি সেই আবেগ দমন করে বললেন, 'আমি সেই জাতে বারিতালাকে ভয় করি। নিজে নিরাপদ অবস্থানে থেকে আমি এই জানবাজদের কি করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেই বলো?'

'এ কথা আপনার আগেই ভাবা উচিত ছিল। এভাবে আপনার আক্রমণ করা উচিত হয়নি। কিন্তু এখন আর এ কথা ভেবে লাভ নেই। আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে আল্লাহর নামে জীবন কুরবানী করতে ভয় পায়। মুজাহিদ যতবেশী মৃত্যুর কাছাকাছি হয় ততই সে আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করে। আমরা এখন দুশমনের ফাঁদে পড়ে আছি। এ অভিযানে আমরা যদি বিজয় অর্জন করতে না পারি তবে শাহাদাতের গৌরব থেকে কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারবে না।'

তকিউদ্দিন আবেগপ্রবণ হলেও বুদ্ধি বিবেক সবটাই গুলিয়ে ফেলেননি। তার মনে পড়ল সুলতান আইয়ুবীর নসিহত, 'নিজেকে একজন বাদশাহ মনে করে কারও ওপর আদেশ চাপিয়ে দিও না। যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে নিজের ভুল গোপন করো না।'

তিনি কমাণ্ডারের রূঢ় আচরণে অপরাধ নিলেন না। বরং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সালারদের ডেকে পরামর্শে বসলেন। যুদ্ধের অবস্থা ও পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা হলো। সিদ্ধান্ত হলো, যে কোন আকস্মিক হামলার যথাযথ জওয়াব দেয়া হবে। এ জন্য কমাণ্ডো বাহিনীকে মূল বাহিনী থেকে সরিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া হবে। তারাই মোকাবেলা করবে অতর্কিত আক্রমণের। রসদ আসার রাস্তা

কমাণ্ডো বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া হবে। পুরো রাস্তায় টহল বসাবে কমাণ্ডো বাহিনী।

সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে। তিন দিক থেকে তারা আক্রমণ চালিয়ে যাবে শত্রুদের ওপর। তকিউদ্দিনের সাথে থাকবে রিজার্ভ বাহিনী। রিজার্ভ বাহিনীতে সৈন্য থাকবে খুবই কম।

এই বিভক্তি ও ব্যবস্থাপনায় উপকার হলো এই যে, সেনাবাহিনী দুর্গম ঊষর মরু এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার সুযোগ পেল। যে দুর্গম টিলা, পাহাড় ও বালির সমুদ্রে আটকা পড়ে পানির অভাবে মারা পড়ার অবস্থা হয়েছিল তাদের তাঁ থেকে বাঁচার সম্ভাবনা উঁকি দিল এর ফলে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যার যার গ্রুপে শামিল হয়ে সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়ল মরুভূমিতে। শত্রুরা তিনটি দলের সঙ্গেই মোকাবিলায় নামল এবং তাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। মুজাহিদরাও শত্রুর সাথে তাল রেখে সুবিধাজনক অবস্থানের দিকে সরে যেতে লাগল।

কমাণ্ডো বাহিনী এবার নিজেদের ফর্মে চলে এল। তারাও বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে দুশমনের ওপর আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবী তাদের শিখিয়েছিলেন কেমন করে ঝটিকা হামলা চালাতে হয়। কেমন করে বিশাল বাহিনীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে মুহূর্তে সবকিছু তছনছ করে আবার ফিরে আসতে হয় নিরাপদ দূরত্বে। কমাণ্ডো বাহিনী এবার সেভাবেই আঘাত হানতে শুরু করল দুশমনদের ওপর। কিন্তু তারপরও স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছিল, সুদানীদের বিশাল বাহিনীর সাথে এ যুদ্ধে সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

কারণ ইতিমধ্যেই মুজাহিদদের খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সেনা সংখ্যাও নেহায়েতই অপ্রতুল। এ সময় বাইরে থেকে সেনা সাহায্য পাওয়ারও কোম সম্ভাবনা নেই। বাধ্য হয়ে কমাণ্ডোরা রাতে আক্রমণ চালাতো আর খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করে মুহূর্তেই সরে পড়তো সেখান থেকে। দুশমনদের বিনাশ করার চেয়ে তাদের দৃষ্টি থাকতো দুশমনের খাদ্য ও রসদের দিকে। ফলে দুশমনকে ঘায়েল করার মত অবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হতো না তাদের পক্ষে। তারা যে খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহ করতে পারতো তা পৌঁছে দিত অন্যান্য গ্রুপ ও সৈন্য দলে।

তকিউদ্দিনের আশংকা ক্রমেই সত্যে পরিণত হতে লাগল। কেন্দ্রীয় কমাণ্ড শেষ হয়ে গেল এরই মধ্যে। তকিউদ্দিন তার বাহিনী নিয়ে ছুটে বেড়াতে লাগলেন এখান থেকে ওখানে। এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, মুজাহিদরা তাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মরুভূমির বালুকারাশি সিক্ত করবে কিন্তু কোন একটি ক্ষুদ্র দলও শেষ পর্যন্ত অস্ত্র সমর্পণ করবে না।

লড়াই বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। মুজাহিদরা আরো ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং লড়াই অব্যাহত রাখলো। ফলে সুদানের ব্যাপক এলাকায় এ খণ্ড খণ্ড লড়াই চলতেই থাকলো। কিন্তু কোন সেক্টর থেকেই এমন কোন সংবাদ এলো না, কোন সৈন্যদল অমুক জায়গায় অস্ত্র সমর্পণ করেছে।

মুজাহিদ বাহিনীর কমাণ্ডাররা নিজ নিজ অবস্থানে থেকে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকলো।

নিয়মিত বাহিনীও এবার অতর্কিত আক্রমণের পথ ধরলো। সবারই অটুট সংকল্প, যে করেই হোক যতক্ষণ তারা বেঁচে থাকবে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, কিন্তু কেউ সুদান ছেড়ে যাবে না বা আত্মসমর্পণ করবে না।

এ ধরনের আক্রমণের ফলে শত্রুদের সমূহ ক্ষতি হচ্ছিল। শেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে গেল যে, শত্রুরা মুসলিম সেনাদের সুদান থেকে বের করে দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। মুসলিম সেনা দল মরুভূমি, পাহাড়, জঙ্গল এমনকি লোকালয়েও ছড়িয়ে পড়লো। তবে বাহিনীর কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর বজায় থাকল না। কোন গ্রুপ কোথায় কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছে বা আঘাত হানছে অন্য গ্রুপ সে খবর জানতে পারছে না। বিশেষ করে তকিউদ্দিন যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি বেখবর হয়ে পড়লেন। তার কাছে এখন আর যুদ্ধের কোন সংবাদ আসছে না। সৈন্যদের জান-মালের ক্ষতির পরিমাণ কত, কত সৈন্য বেঁচে আছে এ ব্যাপারেও তিনি এখন আর কিছুই জানেন না। কিন্তু শত্রুদের পেরেশানি দেখে বুঝা যায়, তারা এখন মুজাহিদদের সামাল দিতে গিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে। তারা যে আর মিশর আক্রমণ করবে না তাদের অবস্থা দেখেই এ কথা বলে দেয়া যায়। কিন্তু এই পদ্ধতির যুদ্ধে কোন বড় ধরনের লাভের আশা করা সম্ভব নয়। কারণ, এভাবে কোন এলাকায় নিজেদের দখল কায়েম করা যায় না, অথচ যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যা ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে যায়।

এই অবস্থায় এসেই তকিউদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর কাছে জরুরী খবর পাঠানোর তাগিদ অনুভব করেন। ফলে একজন

কমাণ্ডারকে সবকিছু বুঝিয়ে সুলতানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কমাণ্ডার সুলতানকে বললো, 'সুদানে সফলতা তখনি সম্ভব যখন ওখানে সেনা সাহায্য পাঠানো যাবে। ওখানকার সমস্ত সৈন্যই এখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সবাই কমাণ্ডো স্টাইলে লড়াই চালিয়ে গেলেও সম্মিলিত বাহিনী হিসাবে তাদের এখন একত্রিত করা সম্ভব নয়। বিক্ষিপ্ত এ বাহিনীকে রক্ষা করতে হলে অনতিবিলম্বে ওখানে একটি সেনাদল পাঠানো প্রয়োজন।'

কমাণ্ডার সুলতান আইয়ুবীকে আরো জানালো, 'তকিউদ্দিন এ কথাও জেনে যেতে বলেছেন, যদি সেনা সাহায্য পাওয়া সম্ভব না হয় তবে কি তিনি এই বিচ্ছিন্ন বাহিনীকে মিশরে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবেন?'

মিশরে যে সৈন্য ছিল সে সৈন্য দ্বারা মিশরের আভ্যন্তরীণ ও বর্ডার নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট নয়। ফলে সেখান থেকে সৈন্যদের সমর সেক্টরে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আবার সুলতান আইয়ুবী সৈন্যদের পিছু হটারও সমর্থক নন। ফলে তাঁর জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে গেল যে, তিনি তাঁর ভাইকে পিছু হঠার আদেশ দেবেন, না দেবেন না। যেখানে এখন তাঁর নিজেরই সেনা সাহায্য প্রয়োজন সেখানে তিনি কিছুতেই তাঁর ভাইকে সেনা সাহায্য দিতে পারেন না। আর যদি তাই হয় তাহলে তাদের পিছু হটার আদেশ দেয়া ছাড়া এ মুহূর্তে তিনি আর কি করতে পারেন? বাস্তবতা বলছে, ওদের সরে আসার হুকুম দাও, আর আবেগ বলছে, মুজাহিদ কখনো ময়দানে পিঠ দেখাতে পারে না, এমন হুকুম তুমি কিছুতেই দিতে পারো না। তিনি গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন।

তকিউদ্দিনের কাসেদ সুলতান আইয়ুবীর কাছে যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলো। কিন্তু সেখানে যে এরই মধ্যে গুপ্ত হত্যা শুরু হয়ে গেছে সে কথা তার জানা ছিল না, ফলে এ ব্যাপারে সে সুলতানকে কিছু বলতেও পারেনি। এসব কথা আরো অনেক পরে সুলতানের গোচরে আসে।

তকিউদ্দিনের বাহিনী তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোথাও এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বসে না থেকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা। কখনো তাদের সামনে পড়তো যাযাবরদের ঝুঁপড়ি ও তাবু। কোথাও সবুজ শ্যামল মাঠ ও শস্য ক্ষেত। তবে অধিকাংশ এলাকাই ছিল অনুর্বর, জনবসতিহীন এবং নিরেট মরুময় অঞ্চল।

এক সন্ধ্যায় মুজাহিদ বাহিনীর তিনজন কমাণ্ডো তাদের এক সিনিয়র অফিসারের কাছে ফিরে এলো। তাদের মধ্যে দুজন আহত। তারা বললো, 'একুশজন মুজাহিদ ও একজন কমাণ্ডার নিয়ে মোট বাইশজনের একটি দল ছিল ওদের। দিনের বেলা দলটি এক জায়গায় লুকিয়ে ছিল। দলের কমাণ্ডার পাহারা দেয়ার ছলে এদিকে ওদিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

এক সুদানী উষ্ট্রারোহী সেখান দিয়ে যাবার সময় কমাণ্ডারকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কমাণ্ডার তার কাছে গেলে তারা পরস্পর কথা বলল। কিন্তু দল থেকে অনেক দূরে থাকায় তারা কি কথা বলেছে জানা গেল না। উষ্ট্রারোহী চলে গেলে দলের কমাণ্ডার এসে সুসংবাদ দিলো, দুই মাইল উত্তরে নাকি একটি গ্রাম আছে, সেখানে শুধু মুসলমানরাই বসবাস

করে। উটের আরোহী সে গ্রামেরই বাসিন্দা। তিনি আমাদের সবাইকে তাদের গ্রামে দাওয়াত করেছেন। বলেছেন, গ্রামের কাছেই নাকি দুশমনের একটি ঘাঁটি আছে। আমরা গেলে শত্রুর সে ঘাঁটি নাকি তারা চিনিয়ে দেবে। আমি তার দাওয়াত কবুল করেছি।'

'তাহলে তো ভালই। পেটও ভরবে হাতও লড়বে।'

'হ্যাঁ, রাতে গ্রামবাসী সবাইকে মেহমানদারী করার পর অভিযানের সময় যুবকরা নাকি আমাদের সঙ্গ দিতেও রাজি হবে।'

মুজাহিদরা সকলেই খুব খুশি হলো এই ভেবে যে, সেখানে খাওয়া-দাওয়া, আদর-আপ্যায়ন ছাড়াও শত্রুদের ওপরে আক্রমণের সুযোগও থাকবে।

সূর্য ডোবার সাথে সাথেই তারা সেই গ্রামের দিকে রওনা হলো। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল শুধু তিনটি যাযাবার ঝুঁপড়ি। ঝুঁপড়ির আশেপাশে গাছপালা ও পানির ব্যবস্থাও আছে। সৈন্যদেরকে ঝুঁপড়ির বাইরে তাবু টানাতে বলা হলো।

সুদানী লোকটি কমাণ্ডারকে একটি ঝুঁপড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। বাইরে মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হলো এবং সকলকে বেশ আদর আপ্যায়ন করেই খাওয়ানো হলো। দলের কমাণ্ডার বললো, 'তোমরা সবাই শুয়ে পড়ো। যখন আক্রমণের সময় হবে তখন তোমাদের জাগিয়ে দেয়া হবে।'

ক্লান্ত সৈনিকরা শুয়ে পড়লো। এই আগত তিনজনের মধ্যে একজনের তখনও ঘুম আসেনি, হঠাৎ পাশের ঝুঁপড়ির মধ্যে নারী কণ্ঠের হাসির ঝংকার শুনতে পেয়ে সে উঠে

বসলো। উঁকি মেরে দেখলো, তাদের কমাণ্ডার সুন্দরী দুই নারীর সাথে হাসাহাসি করছে আর শরাব পান করছে। মেয়েরা যাযাবরদের পোশাক পরে থাকলেও স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছিল, তারা যাযাবর কন্যা নয়।

এ সময় সৈনিকটির কানে ভেসে এল দূর থেকে লোকজনের কথা বলার অনুচ্চ শব্দ। সেদিকে তাকাতেই চাঁদের আলোতে সে দেখতে পেল, মরুভূমির ঠাণ্ডা বালি মাড়িয়ে কিছু লোক বর্শা ও তলোয়ার হাতে এদিকেই আসছে। একবার সে ভাবলো অভিযানে অংশ নেয়ার জন্য আসছে ওরা, তারপরই তার মনে কেন যেন সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সে ঝুঁপড়ির পিছনে গাছের ছায়ায় অন্ধকারে গিয়ে লুকিয়ে পড়লো। দেখতে দেখতে লোকগুলো ঝুঁপড়ির কাছে এসে দাঁড়ালো।

যে ঝুঁপড়িতে কমাণ্ডার মদপান করছিল তার থেকে একটু দূরে আরেকটা ঝুঁপড়িতে ঢুকল একজন লোক। ওখানে কি হচ্ছে দেখার কৌতুহল জাগলো লুকিয়ে থাকা সৈন্যটির মনে। সে গাছের ছায়ার আড়াল নিয়ে অন্ধকারে সন্তর্পনে তার কাছে গিয়ে বেড়ার ফুটোতে চোখ রাখল।

দেখল, লোকটা ঘরে ঢুকেই সেই সুদানীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সুদানী বললো, 'তোমরা এসে পড়েছো? ভালই হল, সবাই ঘুমিয়ে আছে। যাও, শেষ করে দাও সব কজনকে।'

কমাণ্ডারের ঘর থেকে মেয়েদের হাসির ফোয়ারা ছুটছে যেন। রিনিঝিনি চুড়ির আওয়াজ ও হাসির কলকাকলিতে মনে হয় ওখানে উৎসব জমে উঠেছে। মেয়েদের হাসির সাথে

কমাণ্ডারের হাসিও বেরিয়ে আসছে বাইরে।

লোকটি বেরিয়ে এল বাইরে। সঙ্গীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ঘুমন্ত মুজাহিদদের ওপর। কেউ কেউ ঘুমন্ত অবস্থায়ই ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। কেউ হয়তো হাঙ্গামা শুনে জেগে উঠে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ মেলে রেখেই পাড়ি জমাল পরপারে। যারা এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারল, মুহূর্তেই তারা তলোয়ার বের করে প্রতিহত করল আততায়ীদের আঘাত। পুরো ঘটনাটি ঘটে গেল যেন চোখের পলকে। সৈনিকটি তার সঙ্গীদের সতর্ক করারও সময় পেল না।

ঘটনার আকস্মিকতায় সৈনিকটি সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল। তলোয়ারের ঠোকাঠুকি, আহতদের চিৎকার ও আততায়ীদের অট্টহাসি শোনা ছাড়া সে এখন কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। হঠাৎ দেখল, দুজন আহত মুজাহিদ তাবু থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে পালিয়ে যাবার জন্য ভো-দৌড় লাগিয়েছে একদিকে। সম্বিত ফিরে এল তার। সেও ছুটলো তাদের পিছু পিছু। যখন সে তাদের সাথে মিলিত হলো ততক্ষণে তারা অনেক দূর চলে এসেছে। ও দেখল, সঙ্গীরা দু'জনই আহত, তবে কেউ তাদের অনুসরণ করছে না দেখে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

অফিসারের এক প্রশ্নের জবাবে সে আরো বলল, 'কমাণ্ডার উটের আরোহীর দেয়া লোভ লালসায় পড়ে গিয়েছিল, নাকি সে আগে থেকেই শত্রুদের এজেন্ট ছিল এবং নিজের বাহিনীকে ধ্বংস করার সুযোগ খুঁজছিল এ ব্যাপারে আমার কোন ধারনা নেই।'

অফিসার বুঝল, ঘটনা যা-ই হোক, শত্রুরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া সৈন্যদেরকে নির্মূল করতে বাঁকা পথ ধরেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। সম্মুখ লড়াই রূপান্তরিত হয়েছিল চোরাগুপ্তা হামলায়, এবার সে হামলা রূপান্তরিত হলো কুটিল সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রে। এ লড়াইয়ের অস্ত্র এখন মেয়ে আর মদ। মুজাহিদ তীর, তলোয়ার আর বর্শার আঘাত মোকাবেলা করতে পারে, কিন্তু মেয়ে আর মদের মোকাবেলা করবে কি দিয়ে?

এ বড় কঠিন যুদ্ধ। সুলতান আইয়ুবী এ লড়াই সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই তার বাহিনীতে অস্ত্র প্রশিক্ষণের সাথে সাথে নৈতিকতারও প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। কিন্তু ক্ষুধা সহ্য করা বড় কঠিন কাজ। পেটের খিদে আর দেহের খিদে বার বার মানুষকে আক্রমণ করে। শত্রুরা মানুষের এই প্রাকৃতিক দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে শুরু করেছে। সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করছে পাশবিক ক্ষুধা উস্কে দেয়ার কাজে। মুজাহিদদেরকে তারা প্রাণে না মেরে ঈমানে মারার ফন্দি এঁটেছে। এ ভয়ংকর যুদ্ধে আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র শাণিত ঈমান। ঈমানের বর্মে দেহকে আবৃত করতে না পারলে এর থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। কোন অফিসার যাতে এ বর্ম দেহ থেকে খুলে রাখতে না পারে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন সুলতান।

অফিসার ভাবলেন, আমাদেরও এবার এদিকে নজর দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। কারণ এরই মধ্যে এ ধরনের আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথম ঘটনাটি শোনার পর সালার

এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা মনে করেছিলেন। কিন্তু একের পর এক এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকাই প্রমাণ করে এসব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আতাউল হাশেমের ঘটনাটিও তেমনি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না।

আতাউল হাশেম কমাণ্ডো গ্রুপের গ্রুপ কমাণ্ডার ছিলেন। সেদিন তিনি এক জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তার বাহিনী কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে রাস্তার পাশে বসে আরাম করছিল। এ রাস্তাটিই মিশর থেকে রসদ নিয়ে আসার রাস্তা। রসদ নিয়ে আসার পথের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল ওদের। ইতিমধ্যে কয়েকবারই রসদবাহী দলের ওপর চোরাগুপ্তা হামলা হয়েছে। তাদের নিরাপত্তা বিধান করাই ছিল দলটির কাজ।

রসদ বহনকারী দলের ওপর শত্রুরা হামলা করলে তাঁর জানবাজ কর্মীরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্ষা করতো তাদের। সুদানীরা অনেক চেষ্টা করেও এই কমাণ্ডোদের নিঃশেষ করতে পারেনি। বর্তমানে আতাউল হাশেমের নেতৃত্বে একশোর কিছু কম কমাণ্ডো কাজ করছে। রাস্তার একটি দীর্ঘ এলাকায় তারা টহল দেয়ারও ব্যবস্থা নিয়েছে।

আতাউল হাশেম রাস্তা থেকে একটু দূরে টিলার মধ্যে এক গোপন আস্তানা গেড়েছিলেন। আস্তানার বাইরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। সঙ্গে তাঁর ছয় সাতজন জানবাজ সৈনিক। আস্তানাটিকে তিনি আঞ্চলিক ফাঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করছিলেন।

রাস্তা দিয়ে যাযাবার পোষাকে দুইটি মেয়ে ও একজন

মধ্যবয়সী লোককে যেতে দেখলেন ওরা। ওরাও দেখল তাদের। কি মনে করে মেয়ে দুজন ও লোকটি আতাউল হাশেমদের কাছে এগিয়ে এলো। মেয়ে দুটি সুদানী মনে হলেও তাদের পরণে ছিল বিচিত্র পোষাক। তাদের চেহারায় ধূলাবালি লেগেছিল। মুখ ছিল মলিন ও উদাস। তাদের খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। মধ্য বয়সী লোকটির পিছনে মেয়ে দু'টি এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল, যেন পর-পুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বলে তারা লজ্জায় মরে যাচ্ছে।

লোকটি কিছু মিশরীয় কিছু সুদানী ভাষার জগাখিচুড়ি পাকিয়ে কথা বললো। জানালো, তারা মুসলমান। মেয়ে দুটি তার কন্যা। পথে ডাকাতের কবলে পড়ে সবকিছু খোয়া গেছে তাদের। এখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় তারা এতটাই কাহিল যা বলার মত নয়। লোকটি বললো, 'বাপ হয়ে সন্তানের কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না। জীবনে কোনদিন কারো কাছে হাত পাততে হবে এ কথা কখনো কল্পনাও করিনি। আমি আমার জন্য কিছুই চাই না. শুধু এই কচি মেয়ে দুটোকে যদি কিছু খেতে দেন তবে সারা জীবন আপনার জন্য দোয়া করবো।'

আতাউল হাশেম সুদানী ভাষা জানতেন। কারণ তিনি কমাণ্ডো দলের লিডার। সুদানী অঞ্চলে কমাণ্ডারের দায়িত্ব সফলভাবে পালনের জন্য তাকে সুদানী ভাষা শিখতে হয়েছিল। তার কাছে খাবারের কোন অভাব ছিল না। এরই মধ্যে মিশর থেকে দু'তিনবার রসদ আমদানী হয়েছে। তিনি তার অংশের সৈন্যদের রেশন এ আস্তানায়ই মজুদ রেখেছিলেন।

আতাউল হাশেম ওদের তিনজনকেই আস্তানার ভেতর

নিয়ে গেলেন এবং খেতে দিলেন। খাওয়া শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?'

লোকটি একটা গ্রামের নাম উল্লেখ করে বললো, 'গ্রামটির এখন খুবই দুরাবস্থা। কখনও সুদানীরা এসে চড়াও হয়, কখনও মুসলমানরা। উভয় পক্ষেরই ঘরের খাবার জিনিসের ওপর প্রচণ্ড লোভ।'

লোকটি আরো বলল, 'একে তো যুদ্ধাবস্থা, হুটহাট সেনাবাহিনী চড়াও হয় গ্রামে। ঘরে যুবতী মেয়ে, কখন কি অঘটন ঘটে যায় এই ভয়ে সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হতো। মেয়েদের লুকিয়ে রাখতে রাখতে শেষে বিরক্তি ধরে গেল। অবশেষে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কন্যা দুটিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছি। বাপের কাছে মেয়েদের মানসম্ভ্রমই বড় কথা।'

'তা, এখন কোথায় যাবেন আপনারা?'

'ভেবেছিলাম মিশর চলে যাবো। সুদানে মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু মোটেই নিরাপদ নয়। কিন্তু যুদ্ধের যা অবস্থা, এখন তো দেখছি পথ চলাও নিরাপদ নয়।'

'জ্বি, আপনি ঠিকই বলেছেন। যুদ্ধের সময় বাড়ি বা পথ কোন জায়গাই নিরাপদ থাকে না।'

'বাবা, তুমি আমার ছেলের মত। মা মরা মেয়ে দুটোকে নিয়ে আমি যে কি পেরেশানীর মধ্যে আছি সে কথা তোমাকে বলে বুঝাতে পারবো না। তুমি একজন মুজাহিদ, মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর রক্ষক। আমরা তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি কি আমাদের মিশর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার

কোন ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'দেখুন, এখন আমরা যুদ্ধের ময়দানে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তো আমাদের পক্ষে দেশে ফেরা সম্ভব নয়। তবে কয়েকদিন পরপর আমাদের কাছে রসদ আসে। আপনারা চাইলে তাদের সাথে আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

লোকটির চোখ আশায় চকচক করে উঠল। যেন ডুবন্ত তরী তীরের নাগাল পেল। চোখে-মুখে সীমাহীন প্রত্যাশা নিয়ে জানতে চাইল, 'সত্যি পারবে বাবা! যাক, আল্লাহর হাজার শোকর। তিনি আমাদেরকে এই মুসীবত থেকে বাঁচানোর জন্য তোমাকে উসিলা হিসেবে পাঠিয়েছেন। তা বাবা, ওরা আবার কবে নাগাদ আসবে?'

'এসে যাবে কয়েক দিনের মধ্যে।' আতাউল হাশেমের নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর।

'কিন্তু বাবা, এ কয়দিন আমরা কোথায় থাকবো? হায় আল্লাহ, দুটি তরতাজা যুবতী নিয়ে এখন আমি কোথায় যাই!' হায় হায় করে উঠল লোকটি।

'আপনি অস্থির হবেন না। যতদিন ওরা না আসবে ততদিন আপনাদের জিম্মাদার আমি। আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন।' আতাউল হাশেম বললেন।

লোকটি বলল, 'বুঝতে পারছি, যুদ্ধের মধ্যে আমি তোমাকে বেশ বিপদের মধ্যেই ফেলে দিলাম। তারচে এক কাজ করি, ডাকাতের পাল্লায় পড়ে সবকিছু তো আমি খুইয়ে ফেলেছি। আমি না হয় বাড়ি গিয়ে কিছু হাত খরচ নিয়ে আসি। মিশর গিয়ে কিছু করতে হলেও তো টাকা পয়সা

দরকার। ওরা থাক তোমার হেফাজতে, আমি দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসবো।'

মেয়েরা কেঁদে উঠল, 'না বাবা, আমাদের একা ফেলে তুমি যেও না।'

'ধূর পাগলী! একা কোথায়? উনি আছেন না! এরা মুজাহিদ, তোদের ভাই। ভাইয়ের কাছে বোনের থাকতে সংকোচ কিসের? আর আমি তো দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসছি।'

'হ্যাঁ বোন, এখানে ইনশাআল্লাহ তোমাদের কোন বিপদ হবে না।'

লোকটি বলল, 'ঠিক আছে, পথে নামার আগে তাহলে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিই, তোমরা কথা বলো।' লোকটি বিদায় নিয়ে ওখান থেকে চলে গেল।

মেয়ে দুটি ভয়ে ভয়ে চাইল আতাউল হাশেমের দিকে। একজন বললো, 'ভাই, আপনি বলছেন এখানে আমাদের কোন বিপদ নেই, কিন্তু আপনারাই তো মহাবিপদে জড়িয়ে আছেন।'

'সৈনিকের কাছে যুদ্ধ কোন বিপদ নয়, এটা তার স্বাভাবিক কাজ। যুদ্ধ দেখে ভয় পেলে কি মুজাহিদ হওয়া যায়?'

'কিন্তু আমার মনে হয় আপনাদের এই জীবন বড় ভয়ংকর। সারাক্ষণ হয় ভাবেন কখন কাকে কিভাবে মারবেন, নইলে ভাবেন কখন কে মেরে বসে। কি, ঠিক বলিনি আমি?'

'কি যে বলো! মৃত্যু নিয়ে আমরা মোটেও ভাবি না। মানুষ তো জন্মগ্রহণই করে মরার জন্য। মানব জীবনে মৃত্যুর

চাইতে সহজ সত্য আর কি আছে! মরণ অবধারিত, আমরা চাই সে মরণ সুন্দর ও মহান করতে। জেহাদের ময়দানে গাজী হতে পারা গৌরবের আর মৃত্যুবরণ করা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই ও নিয়ে আমাদের কোন দুশ্চিন্তা নেই।'

একটি মেয়ে শিশুর মত সরল কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, 'তাহলে আপনারা কি ভাবেন? বাড়ির কথা, স্ত্রী-সন্তানদের কথা?'

'না, সব সময় তাও ভাবি না। যখন সময় পাই তখন আমরা মনে মনে কি করে দুশমনের মোকাবেলা করবো, কি করে বিজয় ছিনিয়ে আনবো এইসব ভাবি।'

'তার মানে বাড়ির কথা, আপনজনদের কথা আপনাদের মনে পড়ে না?'

'তা মনে পড়ে বৈকি!' আতাউল হাশেম বললেন, 'কিন্তু আমি আমার ফরজ দায়িত্বের কথা কখনো ভুলে যাই না।'

কথা বলতে বলতে পরিবেশ কেমন সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। মেয়েদের মধ্যে যে সংকোচ ও জড়তা ছিল আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল সে সব। মনে হলো পেটে দানাপানি পড়ায় তাদের শরীরেও ফিরে এসেছে নতুন শক্তি, নতুন প্রাণ। সৈনিক জীবনের অজানা কথা জানার কৌতুহল যেন তাদের চলচঞ্চল ও চপল করে তুলল। কথার পিঠে কথা জুড়ে দিল ওরা, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করল। একজন থামলে অন্যজন মুখ খোলে। এ ভাবেই এগিয়ে চলল তাদের আলাপচারিতা।

তাদের উচ্ছল কৌতুহল আর প্রশ্নের পর প্রশ্নে আতাউল হাশেম তার নিজের ও সঙ্গীদের জীবনের অনেক করুণ কথা তুলে ধরল তাদের কাছে। স্মৃতির পাতা হাতড়ে সে সব কথা

তুলে আনতে গিয়ে কখন যে হারিয়ে গেল অতীতের বুকে, ভেসে গেল আবেগের বন্যায়, আতাউল হাশেম তা টেরই পেল না।

মেয়েরা ভাবল, এটাই সময়, এ আবেগের স্রোতে ফেলেই তাকে নিয়ে যেতে হবে অজানা বন্দরে। তাই তারা আসল জায়গায় ঘা দিল, বললো, 'আপনারা দেশ ছেড়ে এত দূর এসে কেন নিজের জীবন নষ্ট করছেন?'

'কি বললে! জীবন নষ্ট করছি?' বিস্মিত আতাউল হাশেম।

'তা নয়তো কি! জেনে শুনে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দেয়ার বোকামী কেন করছেন আপনারা আমার বুঝে আসে না।'

হঠাৎ ঘোর কেটে গেল আতাউল হাশেমের। রাগে জ্বলে উঠল সর্ব অঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ডাকলেন সাথীদের। বললেন, 'এই মেয়ে দুটো এবং এদের নিয়ে আসা লোকটির পা রশি দিয়ে বেঁধে আমার ঘোড়ার পিছনে বেঁধে দাও।'

সঙ্গীরা সাথে সাথে হুকুম তামিল করল। তাদের মাটিতে ফেলে দিয়ে পা শক্ত করে বেঁধে ঘোড়া নিয়ে এলো। রশির এক প্রান্ত ঘোড়ার জিনের সাথে শক্ত করে বাঁধতেই আতাউল হাশেম এক সৈন্যকে বললেন, 'ঘোড়ায় আরোহন করো।'

সে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় আরোহন করলো।

আতাউল হাশেম মেয়ে দু'টিকে দাঁড় করালেন। দুই তীরন্দাজকে বললেন, 'আমার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র মেয়ে দুটির চোখের মাঝে একটি করে তীর বিদ্ধ করবে আর ঘোড়ার আরোহী সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে দিবে।'

ঘোড়ায় বাঁধা লোকটির ব্যাপারে তিনি কিছু বললেন না। লোকটি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিল। সে তখন ভাবছিলো, ঘোড়া যখন দৌড়াবে তখন মেয়েদের সামনে কি কেয়ামতই না নেমে আসবে!

তীরন্দাজরা তাদের ধনুকে তীর জুড়ল, আরোহীরা লাগাম টেনে ধরলো।

আতাউল হাশেম সুদানী মেয়ে দুটি ও লোকটিকে বললেন, 'আমি তোমাদের তিনজনকে মাত্র একবারই বলবো, 'তোমাদের আসল পরিচয় দাও। যে উদ্দেশ্যে এসেছো পরিষ্কার করে বলো, নতুবা তোমাদের শেষ পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।'

সবাই নীরব হয়ে গেল। মেয়েরা তাদের সঙ্গী লোকটিকে দেখলো। সেও নীরব। তারা চোখে চোখে কিছু একটা পরামর্শ করে নিল। সুদানী লোকটি মনে মনে বললো, 'এ বেটা তো বড় হুশিয়ার। মেয়েরা কি শেষ পর্যন্ত এর সামনে টিকতে পারবে?'

আতাউল হাশেম লোকটির পাশে বসে পড়ে বললেন, 'যদি তুমি সত্য কথা বলো তবে তোমার বাঁধন খুলে দেয়া হবে।'

লোকটি চুপ করে থাকলো। আতাউল হাশেম একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। লোকটি তবু চুপ। এবার ক্ষেপে গেলেন আতাউল হাশেম। বললেন, 'শেষ বারের মত বলছি, তুমি কি মুখ খুলবে?'

মুখ খুলল লোকটি। এতক্ষণের গোবেচারা ভাবটি উধাও

হয়ে গেছে তার চেহারা থেকে। সেখানে ক্ষোভ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ।

'তুমি কি মানুষ না পাথর! তোমার কাছে আমি এমন মেয়ে নিয়ে এলাম, যাদের দেখলে ঋষির ধ্যান ভেঙে যায় আর তুমি তাদেরকে তীরের নিশানা বানাচ্ছো? আমার পরামর্শ শোন, তাদেরকে তোমার কাছে রেখে দাও আর সৈন্যদল নিয়ে এখান থেকে চলে যাও। যদি এ প্রস্তাব তোমার মনপূত না হয় তাহলে বলো, আমাদের মুক্তির বিনিময়ে তুমি কি চাও? যদি সোনা চাও তাহলে বলো তার ওজন কত, আর যদি অন্য কিছু চাও তাহলে তাও বলো। সন্ধ্যার আগেই তোমার সব দাবী পূরণ করা হবে।'

আতাউল হাশেম উঠে দাঁড়ালেন। ঘোড় সওয়ারকে বললেন, 'ঘোড়া নিয়ে দুলকি চালে পনেরো বিশ কদম এগিয়ে যাও।'

ঘোড়া কয়েক কদম এগুতেই লোকটি ছটফট করে উঠলো। পনেরো বিশ কদম যাওয়ার পর আতাউল হাশেম বললেন, 'থামো।'

ঘোড়া থামালো সহিস। আতাউল হাশেম এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এখনও সঠিক কথা বলো।'

অবশেষে সব স্বীকার করলো সে। বলল, সে সুদানী গোয়েন্দা সদস্য। খৃস্টানরা তাকে ট্রেনিং দিয়েছে। মেয়ে দুটি জন্মগতভাবে মিশরী। তাদেরকেও খৃস্টানরা সব ধরনের অপকর্ম ও ধ্বংসাত্মক কাজের ট্রেনিং দিয়েই এখানে পাঠিয়েছে।

আতাউল হাশেম তার বাঁধন খুলে দেয়ার হুকুম দিলেন। বাঁধন মুক্ত হওয়ার পর তাকে নিজের পাশে বসিয়ে নরম সুরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। বললেন, 'আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে চাই না। তুমি যে জবানবন্দী দিয়েছো তোমাকে যে কোন কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। এখন সব কথা খোলাখুলি ও সত্য বললে তুমি আমার দয়ার আশা করতে পারো। মনে রেখো, সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করার মত ট্রেনিং আমারও আছে।'

'জনাব, সুদানে ছড়িয়ে পড়া মুসলিম বাহিনীর কমাণ্ডারদের বশীভূত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে।' লোকটি বললো, 'এই কাজে চোখ ধাধাঁনো সুন্দরী নারী এবং যত খুশি সোনা রূপা ব্যয় করার অনুমতি আছে আমার। এসব নারী ও অর্থ দিয়ে আমাদের প্রথম চেষ্টা থাকবে আপনাদেরকে আমাদের দলে ভেড়ানো। এতে ব্যর্থ হলে আমাদের ওপর নির্দেশ হচ্ছে আপনাদের বন্দী করার। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে আপনাদের হত্যা এবং শেষ করে দেয়ার হুকুম আছে আমাদের ওপর।'

'যারা নিয়মিত যুদ্ধ করছে তাদের পিছনে না লেগে তুমি আমার কাছে এলে কেন?'

'তাদের কাছে অন্যরা যাবে। আমাকে বলা হয়েছে, আতাউল হাশেম মুজাহিদদের রসদপত্র আসার রাস্তা এমনভাবে পাহারা দিচ্ছে, যার কারণে আমাদের কমাণ্ডোরা একাধিকবার রসদের ওপর হামলা চালিয়েও কোন সুবিধা করতে পারেনি। এই লোকটির কারণে আমাদের লোকেরা

রসদপত্র তো সংগ্রহ করতে পারলোই না, উল্টো আমাদের বহু মূল্যবান প্রাণের ক্ষতিও হয়েছে। তাই তোমার কাজ হচ্ছে, কমাণ্ডার আতাউল হাশেমের কাছে মেয়ে দুটিকে পৌঁছে দেয়া। তারা ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে আমাদের দলে ভেড়াতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তার ঈমান যদি খুব মজবুত হয় তাহলে এতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সে ক্ষেত্রে তাকে বন্দী করার সুযোগ বের করে দেয়া তোমার দায়িত্ব। তাকে এমন ফাঁদে ফেলবে যেন সে নিরূপায় হয়ে বন্দী হয় অথবা নিহত হয়। যদি এটাও বিপদজনক মনে করো তবে তোমরা তিনজনে মিলে তাকে যে করেই হোক হত্যা করবে।'

লোকটা খুবই আশ্চর্য হলো এই ভেবে যে, আতাউল হাশেম এমন অসামান্য সুন্দরী দুই যুবতীর প্রতি কোনই আগ্রহ প্রকাশ করলো না। আতাউল হাশেম অন্তরঙ্গভাবে তার সাথে কথা বলছে দেখে সে তাকে জিজ্ঞেসই করে বসলো, কেন এমন সুন্দরী মেয়ে ও স্বর্ণ রৌপ্যের প্রস্তাব তিনি হেলায় ঠেলে দিলেন।

আতাউল হাশেম হেসে বললেন, 'তার কারণ আমি দুর্বল ঈমানদার নই।'

আতাউল হাশেম এবার মেয়ে দু'টির কাছে গেলো। জিজ্ঞেস করলো, 'ও যা বলেছে সে ব্যাপারে তোমাদের কোন বক্তব্য আছে?'

মেয়েরা না সূচক মাথা নাড়ল।

একটি মেয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি সবই শুনেছেন। এখন আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবেন?'

আতাউল হাশেম বললেন, 'আগামীকাল সকালে তোমাদের হেডকোয়ার্টারে তকিউদ্দিনের কাছে পাঠিয়ে দেবো। তোমাদের ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেয়ার তিনিই নেবেন।'

তিনি সুদানী লোকটি ও মেয়ে দু'জনকে সঙ্গীদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এদেরকে পৃথক পৃথক স্থানে রাখবে।'

তাদের তল্লাশী নেয়া হলো। প্রত্যেকের কাছে পাওয়া গেল একটি করে ছুরি। আর লোকটির কাছে অতিরিক্ত পাওয়া গেল এক পুটলি নেশার দ্রব্য, হাশিস।

সূর্য তখন ডুবে যাচ্ছে। একটি টহল দল ফিরে এসে রিপোর্ট করলো তার কাছে। সন্ধ্যা হলো। মাগরিবের নামাজ পড়ে তিনি তার বাহিনীর সদস্যদের বললেন, 'রাতের ডিউটির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে আমার সাথে দেখা করবে। আমি তোমাদের বলে দেবো কে কোথায় ডিউটিতে যাবে।'

সৈন্যরা চলে গেল। একটু পরই ফিরে এলো সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে। তিনি সৈন্যদের বিভিন্ন দলকে দূর দূরান্ত পর্যন্ত পাঠিয়ে দিলেন। প্রত্যেককে বলে দিলেন, 'সুদানীরা গোয়েন্দা ও চর ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যাপকভাবে। তিনজন ধরা পড়েছে। এরা মারাত্মক ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োজিত। ফলে চোখ কান খোলা রাখবে। সাবধান থাকবে এদের ব্যাপারে। আর অস্বাভাবিক কোন কিছু চোখে পড়লেই খবর পাঠাবে আমার কাছে।'

আস্তানার পাহারায় নিয়োজিতদের ডেকে বললেন, 'এমনও হতে পারে, এদের সাথী ও দলের লোকেরা এদের

আটকে পড়ার খবর পেয়ে যেতে পারে। তাহলে এদের ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করবে ওরা, হামলা করতে পারে আস্তানায়। পাহারা জোরদার রাখবে। বিশ্রামরত রিজার্ভ সৈন্যদেরও শোয়ার আগে সতর্ক করে দেবে যেন সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে শোয়।'

সবার দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে রাতের খাবার সেরে শুয়ে পড়লেন তিনি। আস্তানার ভেতরে না শুয়ে টিলার চূড়ায় উঠে গেলেন। জায়গাটা উঁচু নিচু। শোয়ার আগে লোকটি ও মেয়ে দুটির কি ব্যবস্থা করেছে দেখে নিলেন। এরপর তিনি টিলার ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

সেখান থেকে তিনি আস্তানার সৈন্যদের আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। ঘুম আসছিল না সে চোখে। কিছুক্ষণ ওভাবে শুয়ে থাকার পর আবার চোখ মেললেন তিনি। মেয়ে দু'টির কথা ভাবছিলেন। আহা! কি কমনীয় চেহারা মেয়ে দু'টির! কি নিষ্পাপ মাসুম কচি মেয়ে! অথচ তাদের দিয়ে কেমন জঘন্য ও ভয়াবহ কাজ করানো হচ্ছে। যদি এরা কোন মুসলমান ঘরের মেয়ে হতো তবে কোন সম্মানী ঘরের বউ হয়ে সসম্মানে থাকতো।

স্ত্রীর কথা স্মরণ হলো তার। যখন সে তার ঘরে বউ হয়ে এসেছিল তখন সে তাদের মতই নব যৌবনা ও আকর্ষণীয়া ছিল। তিনি স্ত্রীর সাথে প্রথম জীবনের সেই রোমান্টিক স্মৃতিতে বিভোর হয়ে গেলেন। এই বিরাণ মরুভূমিতে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি হারিয়ে গেলেন সেইসব দিনগুলিতে। চারদিকে এত যুদ্ধ, এত মৃত্যু, অস্ত্রের

ঝনঝনানি, তলোয়ারের চমক কিছুই এখন আর তাকে স্পর্শ করছে না। যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যরা কখনো কখনো এমনিভাবে কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যায়, মনোহর স্মৃতির মাঝে ভুলিয়ে রাখে মনকে।

চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। মরুভূমির মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে কোমল জোসনা। এটাই মরুভূমির বৈশিষ্ট্য। দিনের বেলা এখানে যেমন থাকে সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ তেমনি রাতের চাঁদনী থাকে স্বচ্ছ ও শীতল। এই শীতলতা যেন তার হৃদয় ও মন থেকে মৃত্যুর বিভীষিকা শুষে নিয়েছে। আতাউল হাশেম উঠে বসলেন। তাকিয়ে রইলেন দূর দিগন্তে। তারপর উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন আস্তানার দিকে। ঘুরে ঘুরে দেখছেন সবকিছু। দেখলেন পাহারাদাররা টহল দিচ্ছে নিয়মমাফিক। সৈন্যরা শুয়ে আছে নিজ নিজ বিছানায়। তিনজন সৈন্যের সাথে শুয়ে আছে সুদানী লোকটি। মেয়েরা শুয়ে আছে ওদের বিছানায়।

আতাউল হাশেম একজন মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের পা দিয়ে চাপ দিলেন মেয়েটির পায়ে। মেয়েটির চোখ খুলে গেল। আতাউল হাশেমকে চিনতে পেরে উঠে বসলো সে। আতাউল হাশেম তাকে উঠে দাঁড়াতে ও তার সাথে যেতে ইঙ্গিত করলেন। মেয়েটি আনন্দচিত্তে উঠে দাঁড়ালো। তার আরো আনন্দ হলো এই ভেবে যে, যৌবনা নারীর যাদুর প্রভাব শেষে এই পাথরের মত কঠিন প্রাণ কমাণ্ডারের মনেও ঢেউ তুলতে পেরেছে!

আতাউল হাশেম হাঁটা দিলেন। মেয়েটি তার পিছু পিছু

পা চালালো। সৈন্যরা বেহুশের মত ঘুমিয়ে আছে। তারা কেউ জানতে বা বুঝতেও পারল না, তাদেরই মাঝ থেকে কোন এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আতাউল হাশেম সৈন্যদের দিকে তাকালেন। তাদের জন্য তাঁর একটু করুণা হলো। কারণ তিনি তো এক অবিশ্বাস্য ধরনের নফসের যুদ্ধে নেমেছেন। এ যুদ্ধেও গাজী হতে চান তিনি।

টিলার ওপরে যেখানে তিনি শুয়েছিলেন মেয়েটিকে তিনি ওখানে নিয়ে গেলেন। শীতল বাতাস বইছে সেখানে। মাথার ওপর তারা ভরা আকাশ। সেদিকে তাকাল মেয়েটি। মাথা থেকে ওড়না লুটিয়ে পড়ল কাঁধে। বাতাসে এলোমেলো হয়ে গেলো চুলগুলি। চাঁদের আলোতে সে চুল সোনার আঁশের মত চমকাচ্ছিল। তিনি অনেকক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মেয়েটি আতাউল হাশেমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি খুবই অবাক হচ্ছি, আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাকে তো আপনার জন্যই এখানে আনা হয়েছে। আপনার যে কোন সাধ পূরণ করার জন্য আমি প্রস্তুত এ কথা কি আপনি বুঝতে পারছেন না?'

তিনি এ কথার কোন জবাব দিলেন না। শুধু নীরবে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে। যেন তিনি এক নীরব পাথর হয়ে গেছেন।

মেয়েটি তার একটি হাত ধরল। বললো, 'আমি জানি আপনি আমাকে কেন ডেকে এনেছেন ও কি চিন্তা করছেন।'

'আমি চিন্তা করছি তোমার বাবা আমার মতই একজন

পুরুষ মানুষ।' আতাউল হাশেম তার হাত থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিলেন। বললেন, 'আমিও বাপ। এই দুই বাপের মধ্যে কত আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এক বাপ কত নির্লজ্জ। আরেক বাপ সন্তানের নিরাপত্তা ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই তাদের ছেড়ে এই যুদ্ধের ময়দানে পড়ে আছে।'

'আমার কোন বাবা নেই।' মেয়েটি বললো, 'তাকে কোনদিন দেখেছি বলেও মনে পড়ে না।'

'তিনি কি মারা গেছেন?'

'সে কথাও জানি না!'

'আর তোমার মা?'

'কোন কিছুই মনে নেই আমার।' মেয়েটি বললো, 'আমার এ কথাও মনে নেই যে, আমি বাড়িতে জন্মেছি না কোন যাযাবরের ঝুঁপড়িতে বা তাবুতে। কিন্তু আপনি এ সময় বেরসিকের মত এ সব কথা বলছেন কেন?'

'আমি আমার সৈনিক জীবনের রসেই ডুবে থাকতে পছন্দ করি।' আতাউল হাশেম বললেন, 'আমি চাচ্ছিলাম তোমাকে তোমার জীবনের অতীতের স্মৃতিময় জগতে ফিরিয়ে নিতে। যেখানে এক মেয়ে মা-বাপের স্নেহ আদরের জন্য কাঙাল থাকে।'

'আমি তো নিজেই এক সৌন্দর্যময় স্মৃতি।' মেয়েটি বললো, 'যার সাথে আমি জীবনের সামান্য সময় কাটিয়ে দেই, সে সারা জীবন আমাকে স্মরণ করে। আমি অন্যের স্মৃতি হয়ে বেঁচে থাকি, আমার নিজের কোন স্মৃতি নেই।'

'তুমি নিজেকে সৌন্দর্যের স্মৃতি না বলে বলো পঙ্কিলতার

স্মৃতি।' আতাউল হাশেম বললেন, 'তোমার শরীরে লেগে আছে অসংখ্য পাপিষ্ঠের পাপের কলঙ্ক। তুমি ভাবছো ওদের মনে তোমার স্মৃতি টিকে থাকবে। ভুল, ভুল তোমার ধারনা। তোমার মত মেয়েদের কোন পুরুষ স্মরণে রাখে না। ওসব মেয়ে শিকারীরা আজ এখানে কাল ওখানে শিকার করে বেড়ায়। দ্বিতীয় শিকার পেলে প্রথমটার কথা ওরা বেমালুম ভুলে যায় চিরদিনের মত।

তোমার এই রূপ যৌবন কচু পাতার পানির মত। কচুপাতা যেমন পানি ধরে রাখতে পারে না, এ দেহও পারে না যৌবন ধরে রাখতে। শৈশব ও কৈশোরে এ যৌবনের কোন ধারনা ছিল না তোমার। দুদিন পরে যখন চেহারায় বয়সের ছাপ পড়বে তখন যৌবনের এ কয়েকটা দিন কেবল স্মৃতি হয়েই থাকবে। চেহারার জৌলুশ নিয়ে অহংকার করো না। আমি এই মুহূর্তেই তোমার চেহারা চিরদিনের জন্য বিকৃত করে দিতে পারি। কিন্তু আমি তা করবো না। এই মরুময় পরিবেশ, মদ আর ব্যাভিচার তোমাকে কয়েক বছরের মধ্যে নিঃশেষ করে দেবে। তখন তোমার অবস্থা হবে ঝরা ফুলের মত। মানুষের পায়ের তলায় পিষে গেলেও যে ফুলের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। আজ যারা তোমার রূপের মোহে ছুটে আসে তোমার কাছে, সেদিন তোমাকে রাস্তায় দেখে তোমার কাতর আবেদন শুনে এইসব সুদানী ও খৃস্টানরা ভিক্ষা দিতেও এগিয়ে আসবে না তোমার কাছে। তুমি যখন শহরের কোন ফুটপাতে পড়ে থাকবে, ওরা তখন ফুটপাত দিয়ে যাওয়ার সময় ঘৃণায় নাকে রুমাল চেপে ধরবে।'

আতাউল হাশেমের বলার মধ্যে ঘৃণা নয় এমন এক দরদমাখা ভাব ছিল যা মেয়েটিকে অস্থির করে তুলল। তার মনে হলো তার বুকের মধ্যে সাইমুম ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সে ঝড়ে যৌবনের দুরন্তপনা উধাও হয়ে গেল। একজন মুসলমান কমাণ্ডারের সামান্য কটি কথা তাকে কাঙাল বানিয়ে ফেলল একটু পিতৃস্নেহের। কেঁপে উঠল মেয়েটির শরীর। সে দু'হাতে মুখ ঢেকে আতাউল হাশেমের পায়ের কাছে বসে পড়ল।

'আমার এক মেয়ে আছে, তোমার চেয়ে দু'তিন বছরের ছোট হবে সে। তার বিয়ে হবে এক সম্মানী ঘরের যুবকের সাথে। যে ছেলে আমার মতই কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে ভাল জাতের ঘোড়ার চেপে ছুটে যাবে যুদ্ধের মাঠে। আমার মেয়ে জায়নামাজে বসে তার জন্য দোয়া করবে আর জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকবে পথের দিকে, কখন ফিরে আসবে তার স্বপ্নের শাহজাদা, এই আশায়। সে তার স্বামীর কাছে হবে স্বপ্নের রাণী। সে তার ভালবাসা দিয়ে জয় করে নেবে শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, দেবর-ননদ সকলের ভালবাসা। পড়শি মহিলারা আমার মেয়েকে এক নজর দেখতে চাইবে তার গুণের কথা শুনে। আমি এই জন্য গর্ববোধ করব যে, আমার মেয়ে ও তার স্বামী পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। সে এক এমন প্রীতি যা সারা জীবনেও শেষ হবার নয়। বুড়ী হয়ে গেলেও তাদের ভালবাসা ও সম্মান অক্ষুণ্ন থাকবে। দিন যত যাবে তার সম্মান বাড়বে বৈ কমবে না। তোমাকে দেখার জন্য কেউ কি আগ্রহ প্রকাশ করবে? তুমি তো তারই মত এক মেয়ে। তোমাকে দুদিন না দেখলে কেউ কি তেমন অস্থিরতা বোধ করবে? করবে না।

কারণ তুমি এক বেপর্দা নারী, মরুভূমির মতই খোলামেলা উন্মুক্ত প্রান্তর। যেখানে কোন রহস্য নেই, পরিচর্যার মত উদ্যান নেই, আবিষ্কারের মত আকর্ষণ নেই। ফলে তোমার কোন সম্মান নেই। কারো কাছে জমা নেই তোমার জন্য একটু স্নেহ বা প্রেম। কেউ নেই যে তোমাকে ভালবাসার যোগ্য মনে করবে।'

'আপনি আমার সাথে এমন সব কথা বলছেন কেন?' মেয়েটি এমন কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করলো যেন সে স্বরটি তার নয়।

'আমি তোমাকে বলতে চাই, তোমার মত মেয়ের পবিত্র হওয়াই উচিত!' আতাউল হাশেম উত্তরে বললেন, 'মুসলমানরা নারী জাতিকে আল্লাহর রহমত মনে করে। প্রেম প্রীতি আর ভালবাসার যে পবিত্র বন্ধনে আমাদের পরিবার গঠিত তুমি যদি তার সন্ধান পেতে তবেই তুমি বুঝতে পারতে, সতীত্ব ও ধর্মের অনুপম মাহাত্ম। শান্তি ও সুখের কি অপূর্ব নেয়ামতে ধন্য আমাদের জীবন সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না। কারণ তুমি সে ভালবাসার সুবাস কোনদিন পাওনি। যে ভালবাসা অন্তরের অন্তস্থলে শান্তির বাগান রচনা করে। দুর্ভাগ্য তোমাদের, তোমরা পুরুষের লোভ-লালসা দেখেছ কিন্তু ভালবাসা দেখোনি।'

মেয়েটির মনে হচ্ছিল, স্নিগ্ধ শীতল নিস্তব্ধ রাতের উন্মুক্ত পটভূমিকায় টিলার ওপর যেন কোন অদৃশ্যলোক থেকে ভেসে আসছে অপার্থিব শব্দমালা। আতাউল হাশেম একটা উপলক্ষ মাত্র।

মেয়েটি অবাক বিস্ময় নিয়ে আতাউল হাশেমের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখতে আর দশজন পুরুষদের মতই একজন পুরুষ বৈ তো নয়! কিন্তু অন্যেরা তার রূপ দেখে যেমন পতঙ্গবৎ ঝাপিয়ে পড়ে, তাঁর মধ্যে তার সামান্যতম আগ্রহও নেই। আতাউল হাশেম কোন নিশ্চল পাথর নয়। তার শরীরেও রক্ত মাংশ আছে, আবেগ উত্তেজনা আছে, কিন্তু তাকে সংযত সংহত করার কি অসামান্য শক্তি রাখে এই লোক!

মেয়েটি অস্থির হয়ে বললো, 'আপনার কথার মধ্যে এমন নেশা ধরানো মাদকতা রয়েছে যে, এমন আমি শরাবে বা হাশিসেও পাইনি। আমি আপনার সব কথা বুঝতে পারিনি, তবে সব কথাই আমার অন্তরে খোদাই হয়ে গেছে।'

মেয়েটি ছিল বুদ্ধিমতি। কারণ হাবাগোবা লোকদের গোয়েন্দা বিভাগে নেয়া যায় না। পুরুষদেরকে আঙ্গুলের ওপরে নাচানোর ট্রেনিং তাকে শিশুকাল থেকেই দেয়া হয়েছে। কিন্তু সে সব ট্রেনিং আজ আর কোন কাজেই এলো না, বরং এই পুরুষটি সাপের বিষ দাঁত ভাঙার মত তার এতদিনের গর্ব ও অহংকার যেন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।

এরপর আতাউল হাশেমের সাথে তার আরো অনেক কথাই হলো। ইসলামের অনুপম সৌন্দর্যের অনেক কিছুই সে জানতে পারল এ আলোচনা থেকে। পেশাদার সুন্দরীর পরিবর্তে মমতাময়ী এক নারীর মহিমা ফুটে উঠল তার কথাবার্তা ও আচরণে। এক সময় সে প্রশ্ন করলো, 'আমাকে আপনারা কেমন শাস্তি দেবেন?'

'আমি তোমাকে কোন শাস্তিই দিবো না।' আতাউল

হাশেম বললেন, 'কাল সকালে তোমাদেরকে আমি প্রধান সেনাপতির কাছে পাঠিয়ে দেবো।'

'তিনি আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবেন?'

'যা আমাদের আইনে লেখা আছে তাই।'

'আপনি কি আমাকে ঘৃণা করছেন?'

'না।'

'আমি শুনেছি, মুসলমানরা একের অধিক স্ত্রী রাখতে পারে।' মেয়েটি বললো, 'যদি আপনি আমাকে আপনার স্ত্রী বানিয়ে নেন তবে আমি আপনার ধর্ম গ্রহণ করবো। সারা জীবন আপনার খেদমতে নিয়োজিত থাকবো।'

'আমি তোমাকে স্ত্রী নয়, কন্যার মর্যাদা দিতে পারি।' আতাউল হাশেম বললেন, 'কারণ তুমি আমার কন্যার বয়সী।'

তারা তখনো আলাপে মগ্ন। মেয়েদের সঙ্গী পুরুষ লোকটি তিনজন সৈন্যের সাথে একত্রে শুয়েছিল। ঘুমের ভান করে বিছানায় পড়ে থাকলেও সে আসলে জেগেই ছিল। সে দেখেছিল আতাউল হাশেম একটি মেয়েকে জাগিয়ে নিয়ে গেছে। এতে সে খুব খুশি হয়েছিল। তার ধারনা ছিল, মেয়েটি আতাউল হাশেমকে প্রেমের জালে ফাসিয়ে দিতে পারবে। আর যদি তা না পারে অন্তত ধোকা দিয়ে তাকে হত্যা করতে পারবে।

সে শুয়ে শুয়ে মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করছিল। অনেকক্ষণ পরও ফিরে না আসায় মেয়েটি কি করছে দেখার কৌতুহল জাগলো তার মনে। সে ঘুমন্ত সৈনিকদের দিকে

তাকালো। বেহুশ হয়ে ঘুমিয়ে আছে তারা। হাসল লোকটি। মনে পড়ল, সন্ধ্যার পর সৈন্যদের সাথে গল্প করার ছলে সে তাদেরকে কিছু হাশিস পান করিয়েছিল।

গ্রেফতার করার সময় তার কাছ থেকে হাশিসের পুটলিটা ছিনিয়ে নিয়েছিল সৈন্যরা। কিন্তু জোব্বার চোরা পকেটে যে হাশিস ছিল সেটা তারা টের পায়নি। সেখান থেকে কিছু হাশিস বের করে তাদেরকে কৌশলে পান করিয়ে দিয়েছিল সে। তারা তো আর এ ধরনের নেশায় অভ্যস্থ ছিল না, তাই অল্প হলেও তা কাজ দিয়েছে বেশি। তারই প্রভাবে সৈন্যরা এখন মরার মত বেহুশ হয়ে ঘুমিয়ে আছে। সুদানী লোকটি এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইল। পালানোর পরিকল্পনা করল সে।

বিছানায় উঠে বসল, তাকালো এদিক ওদিক। আলতো করে উঠে এল বিছানা ছেড়ে। মেয়েটিকে খুঁজতে খুঁজতে টিলার চূড়ায় হঠাৎ সে তাদের দেখতে পেল।

দেখলো, মেয়েটি আতাউল হাশেমের পাশে বসে আছে এবং গল্প করছে। বুঝলো, কমাণ্ডারকে হত্যা করার কোন সুযোগ সে এখনো তৈরী করতে পারেনি। সুতরাং কমাণ্ডারকে হত্যা করার দায়িত্ব এখন তাকেই নিতে হবে এবং এখনই। পায়ে পায়ে ওখান থেকে ফিরে এল সে আস্তানায়। সৈন্যদের ব্যবহার্য ধনুক ও তিন চারটা তীর নিয়ে বেরিয়ে এল ওখান থেকে। পাহারাদারদের দৃষ্টি এড়িয়ে চূড়ার দিকে উঠতে শুরু করল। এমন একটা জায়গায় সে পৌঁছতে চায় যেখান থেকে কমাণ্ডারকে সে স্পষ্ট দেখতে পাবে এবং বেশি দূরেও হবে না।

আতাউল হাশেম যেদিকে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন সেদিক দিয়ে খুব সন্তর্পনে টিলার চূড়ার প্রান্তে পৌঁছে গেল সে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে দেখল মাত্র আট দশ হাত দূরে পিছন ফিরে নিশ্চিন্তে বসে গল্প করছে আতাউল হাশেম। মুখোমুখি বসে আছে বলে মেয়েটির মুখ তার দিকে ফেরানো।

ধীরে সুস্থে ধনুতে তীর জুড়ল লোকটি। কেউ তাকে দেখে ফেলবে বা প্রতিরোধ করবে এমন কোন সম্ভাবনা তার কল্পনায়ও এলো না। মেয়েটি তাকে দেখে ফেললেও কোন ক্ষতি নেই, কারণ ও-তো তারই সহযোগী। তাই তার মধ্যে কোন তাড়াহুড়ার লক্ষণ দেখা গেল না।

নিশানা ঠিক করতে যাবে এমন সময় মেয়েটির চোখে পড়ে গেল লোকটি। আতাউল হাশেম এ সবের কিছুই টের পেল না। অকস্মাৎ মেয়েটি আতাউল হাশেমের কোমরে ঝুলানো ছুরিটির ওপর ঝাপিয়ে পড়ল এবং চোখের পলকে তা ছিনিয়ে নিয়ে সর্ব শক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারল লোকটির গলায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল লোকটি তার আগেই ধনুক থেকে ছুটে গিয়েছিল তীর। তীরটা ছুটে এসে বিদ্ধ হলো মেয়েটির বুকে।

মেয়েটির আচমকা ধাক্কায় আতাউল হাশেম মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। উঠে বসার আগেই 'আহ্' বলে বুক চেপে ধরল মেয়েটি। মেয়েটির ছুঁড়ে মারা খঞ্জর সুদানী লোকটির শাহরগ কেটে দু'ফাঁক করে দিল। তার হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল নিশানাহীন তীর।

বিদ্যুৎ বেগে উঠে বসলেন আতাউল হাশেম। পেছনে ঘাড়

না ফিরিয়েই ঝাপ দিলেন সেদিকে। দুই গড়ান খাওয়ার আগেই যেখান থেকে তীরটি নিক্ষেপ করা হয়েছিল সেখানে পৌঁছে গেলেন। লোকটি দুহাতে গলা চেপে ধরে সেখান থেকে খঞ্জর টেনে বের করার চেষ্টা করছিল।

আতাউল হাশেম দেখলেন লোকটির চেহারা বিকট ও ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। চোখ দুটো কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। এ অবস্থায় কণ্ঠার হাড়ে আটকেপড়া ছুরিটি সে কোনমতে ছুটিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো এবং সামনেই আতাউল হাশেমকে দেখতে পেয়ে আক্রমণের ভঙ্গি করে এক পা এগোল। আতাউল হাশেম জোড়া পায়ে লাথি মারলো তার বুকে। লোকটি দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল, কিন্তু আর উঠতে পারল না। আতাউল হাশেম সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল লোকটির বুকের ওপর। দেখলো, তার শাহরগ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

আতাউল হাশেম খঞ্জরটি তুলে নিলেন। লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে এলেন মেয়েটির কাছে। তীরটি ছুটে এসেছিল খুব কাছে থেকে। মেয়েটির বুকে তা এমনভাবে গেঁথে ছিল যে, তা টেনে বের করার কোন উপায় রইল না। মেয়েটির প্রাণ বায়ু তখনো বেরিয়ে যায়নি। ডাগর দুটি চোখ মেলে সে তাকিয়েছিল শূন্য পানে।

আতাউল হাশেম মেয়েটির পাশে ঝুঁকে পড়লেন। মেয়েটি আতাউল হাশেমের একটি হাত আঁকড়ে ধরল নিজের হাতে। বলল অস্ফুটস্বরে, 'আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। যে শান্তির বাণী আপনি আমাকে শুনিয়েছেন একটু আগে, আল্লাহ

যেন আমার আত্মাকে সে শান্তি আশ্রয়ে ঠাঁই দেন। আমার আত্মা যেন আমার দেহের মত এই মরুভূমিতে আর পথহারা হয়ে ছুটে না বেড়ায়। আমার এ দেহ পাপের সাগরে হাবুডুবু খেয়েছে সারা জীবন। আমাকে আশ্বাস দিন, আমার এই ক্ষুদ্র নেক কাজের বিনিময়ে আল্লাহ আমার সমস্ত গোনাহখাতা মাফ করে দেবেন। আমার মাথার ওপর ঠিক তেমনিভাবে হাত বুলিয়ে দিন, যেমন নিজের মেয়ের মাথায় হাত বুলাতেন আপনি।'

আতাউল হাশেম তার মাথাটা টেনে নিলেন নিজের কোলে। তারপর সেখানে স্নেহের পরশ বুলাতে বুলাতে বললেন, 'আল্লাহ, তুমি আমার এই অবুঝ কন্যার জীবনের সমস্ত গোনাহখাতা মাফ করে দাও। আমার এ মেয়ে তো নিষ্পাপ ছিলো, তোমার অবাধ্য গোলামরা তাকে দিয়ে পাপ করিয়েছে। তাকে কেউ কোনদিন সৎ ও নেক পথের আলো দেখায়নি।'

মেয়েটি যন্ত্রণায় কাতর হয়ে কাৎরাচ্ছিল আতাউল হাশেমের হাত শক্ত করে ধরে দ্রুত বলে উঠল, 'আমার কথা শুনুন, এখান থেকে তিন ক্রোশ পূর্বদিকে সুদানীদের একটা ক্যাম্প আছে। সেখানকার প্রতিটি সৈনিক আপনাদের নির্মূল করার জন্য বদ্ধপরিকর। শুনুন, আপনার সৈনিকরা চারদিকে বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে গিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার জোগাড় করেছে। ওরা এভাবে ছড়িয়ে থাকলে তাদের ভাগ্যে মৃত্যু অথবা বন্দী ছাড়া গতি নেই। আপনাদের প্রতিটি দল ও কমাণ্ডারের পিছনে আমার মত মেয়েরা লেগে রয়েছে। আমার

সাথে যে মেয়েটি এসেছে তার সাথে মিলে এ পর্যন্ত আমি আপনার চারজন গ্রুপ কমাণ্ডারকে ফাঁসিয়ে শেষ করেছি।

মিশরের চিন্তা করুন! ক্রুসেডাররা সেখানে খুব ভয়াবহ ও সুপরিকল্পিত জাল বিস্তার করে রেখেছে। আপনার জাতির অভিজাত শ্রেণী ও সেনাদের মধ্যে এমন কিছু নেতৃস্থানীয় লোক রয়েছে যারা খৃস্টানদের বেতনভুক কর্মচারী। সেই সব চর ও গাদ্দাররা সবাই প্রকাশ্যে আপনাদের বন্ধু সেজে থাকে কিন্তু তারা মূলত খৃস্টানদের আজ্ঞাবহ। তারা আমার মত সুন্দরী মেয়ে ও অর্থ সম্পদের গোলাম হয়ে বিকিয়ে দিয়েছে নিজেদের ঈমান। মিশরকে বাঁচান। সুদান ত্যাগ করে চলে যান যদি মিশরকে বাঁচাতে চান। দুশমনদের শায়েস্তা করার আগে গাদ্দারদের নির্মূল করুন! আমি কারো নাম জানিনা, যেটুকু জানা ছিল বলে দিলাম।

আপনিই আমার কাছে প্রথম পুরুষ যিনি আমাকে মেয়ের মর্যাদা দিয়েছেন। আপনি আমাকে পিতার স্নেহ দিয়েছেন। তার বিনিময়ে আমি আপনাকে আপনার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে গেলাম। আপনি আপনার বিচ্ছিন্ন বাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ করুন এবং আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। দু'তিন দিনের মধ্যেই আপনার ওপর বড় ধরনের আক্রমণ হবে। ফাতেমীয় ও ফেদাইন দলের লোকদের থেকে খুব সাবধান! এই দু'টি দল মিশরের বহু নামীদামী লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরী করে রেখেছে। জাতির কল্যাণ চিন্তায় যারা সব সময় অস্থির, যারা ত্যাগী ও সৎ, তাদের প্রায় সকলেই তাদের টার্গেটে আছে। সবার ওপরে আছে সুলতান

সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর নাম, আপন দেশ ও জাতির জন্য যার ত্যাগ ও কোরবানীর পরিমাপ করার সাধ্য আমার নেই।'

মেয়েটির আওয়াজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ পর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিরদিনের জন্য নীবর হয়ে গেল সে।

ততক্ষণে রাত শেষ হয়ে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। একটু পর সকাল হল। আতাউল হাশেম লাশ দু'টি ও জীবিত মেয়েটাকে নিয়ে প্রধান সেনাপতি তকিউদ্দিনের কাছে চলে গেলেন। তিনি প্রধান সেনাপতিকে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে খুলে বললেন। মেয়েটি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাকে যে সতর্কবাণী শুনিয়েছে তাও জানালেন তাকে। তকিউদ্দিন আগে থেকেই যুদ্ধের বিপর্যস্ত অবস্থায় যথেষ্ট পেরেশান ছিলেন, এসব কথা শুনে তিনি আরও অস্থির হয়ে গেলেন।

'আমি আমার ভাইয়ের আদেশ ছাড়া পিছু হটতে পারি না।' বললেন তকিউদ্দিন, 'আমি একজন দায়িত্বশীল ও বিচক্ষণ কমাণ্ডারকে ক্রাকে পাঠিয়েছি। তার ফিরে না আসা পর্যন্ত সকলকেই নিজ নিজ সেক্টরে দৃঢ় হয়ে অবস্থান করতে হবে।'

সুলতান আইয়ুবী কমাণ্ডারের কাছ থেকে শোনা যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। সামরিক উপদেষ্টাদেরও ডেকে সামগ্রিক পরিস্থিতি তাদের সামনে সবিস্তারে উপস্থাপন করলেন। তিনি ভাবছিলেন, ছড়িয়ে পড়া সৈন্যদের আবার ঐক্যবদ্ধ করে পিছু হটানো সহজ ব্যাপার

নয়। শত্রুরা তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে দেবে না। আর পিছু ফিরাতে গেলে ঐসব সৈন্যদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। যেমন মিশরে হয়েছে। এতে কেবল ওখানকার সৈন্যদের মন ভাঙবে এমন নয়, এখানে যারা আমার সঙ্গে আছে তাদেরও মন ভাঙবে, এমনকি সমগ্র মিশরেই এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু বাস্তবতা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখাও মুশকিল।

নিজকে নিজে ধোঁকা দেয়া ভয়ংকর ব্যাপার। বাস্তবতার দৃষ্টিতে তকিউদ্দিনকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ময়দান থেকে ফিরে যেতে বলাই আমার উচিত। কারণ আমি তাকে কোন সেনা সাহায্য পাঠাতে পারছি না। নিজেও ক্রাকের অবরোধ উঠিয়ে তার সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারব না। আমার ভাই বিরাট ভুল করে ফেলেছে। তার মূল্যবান সেনাবাহিনীর ক্ষতি সাধন করেছে।

'এটা জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন হতে পারে না।' একজন উপদেষ্টা বললেন, 'আমাদের এখন সুদানের যুদ্ধ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া উচিত। নেতা ও শাসকদের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য সেনাবাহিনীর বদনাম হচ্ছে। এখন জাতিকে এই কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া উচিত যে, সুদানে আমাদের সৈন্যদের ব্যর্থতার দায়িত্ব শুধু সৈন্যদের ওপর বর্তায় না, শাসকরাও এর অংশীদার।'

'নিঃসন্দেহে এটা আমার ভাইয়ের ভুলের কারণেই ঘটেছে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আর এ ভুলের শরীক আমিও। কারণ আমি তকিউদ্দিনকে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে

নিষেধ করিনি। আমি তাকে বলেছিলাম, অবস্থার প্রেক্ষিতে তুমি যে কাজ করা উচিত মনে করো, তা তুমি করতে পারো। সবকিছু আমাকে না জানালেও চলবে। ও যে এতবড় একটা কাজ বাস্তবতা যাচাই না করেই করে ফেলবে ভাবিনি। এখন সে নিজেকে শত্রুর দয়া ও করুণার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। আমি আমার ও আমার ভাইয়ের ত্রুটির কথা জাতির কাছে এবং নূরুদ্দীন জঙ্গীর কাছে গোপন করব না। আমি ইতিহাসকে ধোকা দিতে পারি না। আমি লিখিতভাবে স্বীকার করব, এই পরাজয়ের দায়িত্বভার সৈন্যদের ওপর নয়, আমাদের ওপরই বর্তায়। নইলে আমাদের ইতিহাস পরবর্তী শাসকদের সর্বদা ধোঁকা দেবে। আমি মুসলিম রাজ্যের পরবর্তী সুলতান, বাদশা ও আমীরগণের জন্য এ দৃষ্টান্ত রেখে যেতে চাই যে, তারাও যেন নিজের ভুলত্রুটি গোপন করে তার দায়দায়িত্ব নিরপরাধ সৈন্য ও জনতার ওপর না চাপায়। এটা এমন এক ভুল, যা বিশ্বের বুকে ইসলাম প্রসারিত করার পরিবর্তে ইসলামকে খাটো করে দেবে।'

সুলতান আইয়ুবীর চেহারা লাল হয়ে গেল। তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগলো। মনে হল, নিজের মুখে পিছু হটার শব্দ উচ্চারণ করতে তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছে। কারণ, তিনি কখনও পিছু হটেননি। প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করতে আপত্তি নেই তার, তার আপত্তি পরাজয় মেনে নেয়ায়। কিন্তু এখন অবস্থা তাঁকে জীবনের দুঃসহ কাজটি করতে বাধ্য করছে।

তিনি তকিউদ্দিনের প্রেরিত কমাণ্ডারকে বললেন, 'তকিউদ্দিনকে গিয়ে বলবে, তোমার ভাই তোমাকে তোমার

বাহিনী সুসংহত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন গ্রুপকে আবার একত্র করতে বলবে। তারপর তাদেরকে একটু একটু করে মিশরের সীমান্তের দিকে সরিয়ে নিয়ে আসতে বলবে তাকে। শত্রুদের পিছু ধাওয়া করার সুযোগ দেবে না। পেছনে হটবে লড়াই করতে করতে। যেন তারা ভাবে তোমরা তাদেরকে এমন কোন জায়গায় নিয়ে আসতে চাও, যেখানে এলে তোমরা তাদেরকে চূড়ান্ত আঘাত হানবে। সীমান্তে পৌঁছে তোমরা সংঘবদ্ধভাবে মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। কোন অবস্থাতেই দুশমনকে মিশরের মাটিতে পা দেয়ার সুযোগ দেবে না।

যদি শত্রুরা সীমান্ত পেরিয়ে মিশরের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে তবে তাদেরকে প্রবলভাবে বাঁধা দেবে। সীমান্তে একবার দাঁড়ানোর পর দুশমনকে কোনঠাসা করার জন্য কমাণ্ডো বাহিনীর সহযোগিতা নিতে বলবে তাকে।

কোন দলকে যেন অন্য দল শত্রুদের আক্রমণের মধ্যে ছেড়ে না আসে। যত কঠিন পরিস্থিতিই হোক, সর্বাবস্থায় সবাই এক সাথে থাকবে। আমি পিছু সরে আসাকে সহ্য করতে পারি কিন্তু কারো অস্ত্র সমর্পণ করাকে আমি মোটেই বরদাশত করবো না। পিছু হটা সহজ ব্যাপার নয়। অগ্রসর হওয়ার মাঝে যে ঝুঁকি থাকে পিছনে সরে আসার ঝুঁকি তারচে কোন অংশে কম নয়। যে কোন অবস্থার দিকে কড়া দৃষ্টি রাখার জন্য দ্রুতগতিসম্পন্ন সশস্ত্র গোয়েন্দাদের সব সময় কাজে লাগাবে।

আমি তোমাকে কোন লিখিত পয়গাম বা চিঠি দেবো

না। যদি পথে শত্রুর হাতে ধরা পড়ো তবে সবকিছু প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকা আছে। সাবধানে পথ চলবে। কারণ পথে বিপদে পড়ার ঝুঁকি আছে।'

সুলতান আইয়ুবী কমাণ্ডারকে আরো কিছু নির্দেশনা দিয়ে বিদায় করলেন। তখনও তার অশ্বখুরের খটাখট শব্দ শোনা যাচ্ছিল, এমন সময় জাহেদান তাবুর মধ্যে প্রবেশ করে বললেন, 'কায়রো থেকে এক কাসেদ এসেছে।'

'তাকে এখুনি ভেতরে পাঠিয়ে দাও।' বললেন সুলতান আইয়ুবী।

ভেতরে প্রবেশ করলেন সুলতানের গোয়েন্দা বিভাগের এক পদস্থ কর্মকর্তা। তিনি মিশরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এক হতাশাব্যঞ্জক খবর নিয়ে এসেছেন।

তিনি বললেন, 'মিশরে শত্রুদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ খুবই বেড়ে গেছে। আলী বিন সুফিয়ান শহর থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র রাত দিন ছুটে বেড়াচ্ছেন। অসম্ভব ব্যস্ততায় কাটছে তার সময়। তিনি আশংকা করছেন, যে কোন মুহূর্তে মিশরে সেনা বিদ্রোহ ঘটে যেতে পারে।'

সুলতান আইয়ুবীর চেহারার রঙ যেন একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। যদি তিনি এখন মিশরে থাকতেন তবে তিনি এ সব ব্যাপার নিয়ে কোন পরোয়াই করতেন না। তিনি মিশরকে খুবই ভয়ংকর অবস্থা থেকে বাচিয়েছিলেন। খৃস্টান ও ফাতেমীয়দের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কঠিন আঘাতকে তিনি ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। সমুদ্রের দিক থেকে ক্রুসেড বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। বিলাসপ্রিয় এবং দেশ ও

জাতির ব্যাপারে উদাসীন খলিফাকে পদচ্যুত করে জাতির সামনে যে কঠিন বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথেই তার মোকাবেলা করেছিলেন। কিন্তু এখন ক্রাক শহর অবরোধ করে তিনি নিরূপায় হয়ে পড়েছেন। এখন এখান থেকে অনুপস্থিত থাকার অর্থ যুদ্ধের গতি শত্রুদের হাতে তুলে দেয়া।

তিনি শুধু ক্রাক দুর্গই অবরোধ করেননি, শহরের বাইরে ক্রুসেড বাহিনীর এক বিরাট দলকেও ঘেরাওয়ের মধ্যে ফেলে রেখেছেন। এই ক্রুসেড বাহিনী আবেষ্টনী ভেদ করার জন্য হামলার পর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে এক রক্তাক্ত যুদ্ধ চলছে প্রতি মুহূর্তে। সুলতান আইয়ুবীর রণকৌশল ও কুশলী চালের ফলে বিপদের ঘেরাটোপে পড়ে ছটফট করছে খৃস্টানদের বিশাল বাহিনী। যুদ্ধ এখন এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যখন তাঁর কমাণ্ড ও নির্দেশনা ছাড়া এই যুদ্ধ সন্তোষজনক পরিণতির দিকে এগিয়ে নেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ওদিকে সুদানের অবস্থাও মিশরকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এটা একটা বাড়তি সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সুলতান আইয়ুবীর কাছে এটা পরিষ্কার, যদি তকিউদ্দিন পালানোর মনোভাব নিয়ে পিছু হটা শুরু করে তবে শত্রুরা তাদেরকে পথেই শেষ করে দেবে এবং তারপর তারা সোজা মিশরে ঢুকে যাবে।

এদিকে ক্রাকের অবরোধের আশু কোন সমাধানের সম্ভাবনা নেই। এই দুই সেক্টরের নাজুক অবস্থার মধ্যে মিশরে

সেনা বিদ্রোহের আশংকা খুবই বেদনাদায়ক।

এ সংবাদ সুলতান আইয়ুবীর পা কাঁপিয়ে দিয়েছে। তিনি কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে তাবুর মধ্যে পায়চারী করলেন। এক সময় বলে উঠলেন, 'আমি ক্রুসেডারদের সমস্ত সৈন্যের মোকাবেলা করতে পারি। তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে বাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছে তাদের মোকাবেলার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র বাহিনীই যথেষ্ট। কিন্তু জাতির গুটিকয় গাদ্দার আমাকে পরাজিত করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার মোকাবেলা করা আমার জন্য খুব কষ্টের ও দুঃখের।'

যে সব মুসলমান খৃস্টানদের হয়ে কাজ করছে তারা যদি ধর্ম পরিবর্তন করে খৃস্টান হতে চায় তবে খৃস্টানরা তাদের বাঁধা দিয়ে বলে, 'না না, তোমরা তোমাদের ধর্মেই থাকো। তোমরা আমাদের কাছ থেকে বেতন নেবে আর জাতির সাথে গাদ্দারী করবে।'

তিনি নীরব হয়ে গেলেন। তাবুর মধ্যে যারা বসেছিল তারাও নীরব হয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবী সকলকে বার বার লক্ষ্য করলেন। মনে হলো তিনি কিছু বলতে চান কিন্তু কিভাবে বলবেন স্থির করতে পারছেন না। অবশেষে এ ধারনাই সত্য প্রমাণ হলো। তিনি সবার দিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে কঠিন পরীক্ষা নিতে চান। যদি আমরা সকলেই সেই পরীক্ষার জন্য তৈরী থাকি তবে অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাফল্য দেবেন। এটা আল্লাহর ওয়াদা। শর্ত হলো, ঈমানের দাবী পূরণের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। এরপর সকল

পরিণতে সে সিদ্ধান্তের ওপর অনড় অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূরণ করেন। আমরা যদি আমাদের সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকতে পারি, ময়দানে যদি আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের কদমকে মজবুত রাখতে পারি, তাহলে আল্লাহ তার ওয়াদা পূরণ করবেনই। আল্লাহর ওয়াদা মিথ্যা হতে পারে না, প্রশ্ন হলো আল্লাহর ফয়সালা আসার আগ পর্যন্ত আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো কি না?'

তিনি তাঁর সামনে বসা সামরিক উপদেষ্টা ও সেনা অফিসারদের দিকে তাকিয়ে তাঁর বিশ্বাস ও একীনের কথা বললেন। বললেন, 'কোন ঈমানদার আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারেন না। আর আল্লাহ যাদের মোহাফেজ হন তাদের পরাজিত করে দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই। এখন প্রয়োজন আপনাদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও সঠিক সিদ্ধান্ত। আমি বিশ্বাস করি, বিজয় ও সাফল্য সব সময় লুকিয়ে থাকে সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর।' থামলেন সুলতান।

একটু আগে যে দুঃশ্চিন্তা এসে ভর করেছিল তাবুর ভেতর, সকলের চেহারা থেকে সে দুঃশ্চিন্তা বিদায় নিয়ে সেখানে সংকল্পের এক অনড় দৃঢ়তা ফুটে উঠল। প্রত্যেকের চেহারায় সে দৃঢ়তার ছবি অটল ভাস্কর্যের মত স্থির হয়ে আছে।

•

সুলতান আইয়ুবীকে বলা হয়েছিল, মিশরে ক্রুসেডারদের ধ্বংসাত্মক কাজ বেড়ে গেছে এবং সেখানে বিদ্রোহের আশংকা আছে। কিন্তু পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তার কিছুই তাকে খুলে বলা হয়নি। প্রকৃত ঘটনা আরও ভয়াবহ! তার অনুপস্থিতির

সুযোগ নিয়ে খৃস্টানরা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে। সেনাবাহিনী, সরকারী অফিসার এবং শাসকদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে ভাগ করে ওদেরকে খেলাচ্ছে খুব।

তকিউদ্দিন সুদানে অভিযান নিয়ে চলে যাওয়ার কয়েক দিন পরই তিনি খাদ্য ও রসদ চেয়ে পাঠান। সংবাদ বাহককে বলে দেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রসদ পাঠাতে বলবে। কিন্তু দুদিন চলে যাওয়ার পরও রসদ পাঠানোর কোন উদ্যোগ না দেখে সে সরকারী রসদ ভাণ্ডারের প্রধান নির্বাহীর সাথে দেখা করে। তার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'রসদ না থাকলে পাঠাবো কোত্থেকে? এক সাথে দুই সমরাঙ্গণে পাঠানোর মত পর্যাপ্ত রসদ আমার কাছে জমা নেই। এক পারা যায় আইয়ুবীর সৈন্যদের ক্ষুধার্ত রেখে ওদের চাহিদা মিটানো, আর পারা যায় কায়রোর বাজারের সমস্ত খাদ্যশস্য কিনে সেখানে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। তুমি আমাকে এর কোনটা করতে বলো?'

এরপর সে খাদ্য বিভাগের সচিবের সাথে দেখা করে। সচিব সুলতান আইয়ুবীর এক সময়ের সঙ্গী ও বন্ধু ছিলেন। তিনিও প্রায় একই ধরনের কথা বললেন। তার বক্তব্যে আর সন্দেহ করা চলে না। ফলে খাদ্য শস্যের ঘাটতি আছে স্বীকার করেও তাকে অনুরোধ করা হলো, যে কোন প্রকারেই হোক সমর সেক্টরে খাদ্য পাঠানোর।

এ অনুরোধের পর সচিব রসদের ব্যবস্থা করলেন বটে তবে তাতে পাঁচ দিন সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। পঞ্চম দিন রসদ নিয়ে কাফেলা রওনা হলো। উট ও খচ্চরের বিরাট এক কাফেলা। তকিউদ্দিন খাদ্যশস্য পাহারা দেয়ার জন্য কাফেলার

সাথে অশ্বারোহী সৈন্য পাঠানোর জন্য বলে দিয়েছিলেন। সচিবকে বলা হলো সে কথা। তিনি তাতে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'এর কোন প্রয়োজন নেই। রাস্তাঘাট যথেষ্ট নিরাপদ আছে। তাছাড়া মিশরে এখন যে পরিমাণ সৈন্য আছে এখানেই তাদের প্রয়োজন রয়েছে।'

ফলে কোন রকম পাহারা ছাড়াই রসদপত্র পাঠিয়ে দেয়া হলো। রসদ পাঠানোর ছয় দিন পর সংবাদ এল, রাস্তায় সুদানী শত্রুরা সমস্ত রসদ ও রসদবাহী উট, গাধা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আর আরোহীদের সকলকে হত্যা করেছে।

কায়রোর শাসক ও সেই সচিব এ সংবাদে খুব অস্থির হয়ে উঠলেন। র[illegible] নষ্ট হয়ে যাওয়া কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। সুদানের যুদ্ধ[illegible]ানে সৈন্যের প্রয়োজন অনুভব করেও তাঁর অস্থিরতা বেড়ে গেল। তিনি ভাণ্ডার কর্মকর্তাকে বললেন, 'জরুরী ভিত্তিতে সেই পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে পাঠাও।'

উত্তরে সে বললো, 'বাজারে খাদ্যশস্যের ঘাটতি আছে। ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্য আমদানী করতে বলতে হবে। মজুতদারদের গুদাম খুলে আমি দেখেছি, সব গুদাম খালি। মাংসের জন্যও দুম্বা বা বকরির কোন ব্যবস্থা নেই।'

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, মিশরে যে সৈন্য আছে তারাও পুরোপুরি রেশন পাচ্ছে না। ফলে সৈন্যদের মধ্যে অস্থিরতা ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

ব্যবসায়ীরা বললো, 'গ্রাম থেকে কোন খাদ্যশস্য বাজারে আসছে না।'

আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগকে হঠাৎ করে এ

খাদ্য ঘাটতির কারণ অনুসন্ধানের জন্য তৎপর হতে বলা হলো। তারা খোঁজ নিয়ে দেখলো, কায়রোর বাইরে থেকে লোকজন গ্রামে আসে আর বাজার দরের বেশি দাম দিয়ে সকল পশু ও খাদ্যশস্য কিনে নিয়ে যায়। এর অর্থ হলো দেশ থেকে খাদ্যশস্য অন্য দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। তখনই আলী বিন সুফিয়ানের মনে পড়লো, তিন চার বছর আগে সুলতান আইয়ুবী মিশরের সেনাবাহিনীতে ব্যাপক রদবদল করেছিলেন। তখন অধিকাংশ সেনা সদস্যই ছিল সুদানী বাসিন্দা। বিদ্রোহের অপরাধে তাদের তিনি বরখাস্ত করেন। পরে সীমান্ত এলাকার কৃষিযোগ্য জমিতে তাদের পূনর্বাসিত করেন। তারা তাদের উৎপাদিত শস্য মিশরের বাজারে বিক্রি করা বন্ধ করে দেয়ার ফলেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

এ তথ্য উদঘাটিত হওয়ার পর খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজ সেনাবাহিনীর ওপর ন্যস্ত হলো। রাত দিন দৌড়াদৌড়ির পর তারা যে যৎসামান্য খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে পারলো তা সুদানের সেক্টরে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

খাদ্য সচিবের কাছে এ সমস্যা জটিল হয়ে দেখা দিল। এর আগে এমন খাদ্য ঘাটতি আর কোনদিন হয়নি। তার ভয় হলো, যদি সুলতান আইয়ুবী রসদ চেয়ে পাঠান তবে কি জওয়াব দেবেন? সুলতান আইয়ুবী কিছুতেই স্বীকার করবেন না মিশরে খাদ্য ঘাটতি আছে, দেশে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করছে।

এই সমস্যার সমাধান করার জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হলো। এই কমিটির একজন ছিলেন হাকিম আল ইদরিস। তিনিই এ কমিটির প্রধান ছিলেন। অন্য দুজন

ছিলেন বেসামরিক প্রশাসনের দুই পদস্থ কর্মকর্তা।

কমিটি বৈঠকে বসলো। আল ইদরিসকে অপর দুই সদস্য বললো, 'সুলতান আইয়ুবী একই সাথে দুই দিকে রণাঙ্গণ খুলে ভীষণ ভুল করেছেন। তকিউদ্দিন সুদানে গিয়ে এখন আত্মরক্ষার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।'

'ফিলিস্তিন মুসলমানদের জন্মভূমি।' আল ইদরিস বললেন, 'সেখান থেকে ক্রুসেডারদের বের করা মুসলমানদের জন্য ফরজ। মুসলমানরা ওখানে কীট পতঙ্গের মত জীবন যাপন করছে। সেখানে পর্দানশীল মুসলিম মহিলাদের ইজ্জত আবরু নিরাপদ নয়। মসজিদসমূহ ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত হয়েছে।'

'এ সবই মিথ্যা দোষারোপ।' একজন বললো, 'আপনি কি সচক্ষে দেখেছেন; খৃস্টানরা মুসলমানদের ওপরে জুলুম করছে, অত্যাচার করছে?'

'আমি অত্যন্ত বাস্তব ও সত্য কথা বলেছি।' ইদরিস বললেন।

'আপনি যা জানেন তা সত্য নাও হতে পারে। আমার মনে হয়, আমাদের কাছে সত্য গোপন করা হচ্ছে।' অন্য সদস্য বললো।

'সুলতান আইয়ুবী সম্মানিত ও প্রশংসাযোগ্য ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তাই বলে আমাদের সত্য কথা বলতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। সুলতান আইয়ুবীকে সাম্রাজ্যবাদী নেশা পেয়ে বসেছে। তাঁকে এই নেশা কোথাও স্থির হয়ে শান্তিতে বসতে দিচ্ছে না। তিনি আইয়ুবী বংশকে রাজ বংশে পরিণত করতে চান।' সেই

সদস্য আরো বলল, 'ক্রুসেড বাহিনী এক সর্বজয়ী বাহিনী। আমরা তার মোকাবেলা করতে পারবো না। আর ওরা যে আমাদের শত্রু এমনও নয়। যদি ক্রুসেড বাহিনী আমাদের শত্রুই হত তবে তারা মিশরের ওপরেই আক্রমণ চালাতো। তাদের কাছে এত বেশি সৈন্য আছে যে, আমাদের এই ক্ষুদ্র বাহিনীকে কবেই পদদলিত করতে পারতো। তারা সুলতান সালাহউদ্দিনের শত্রু হতে পারে, আমাদের শত্রু নয়।'

'আপনাদের কথা আমার কাছে ক্ষমার অযোগ্য।' আল ইদরিস বললেন, 'বরং ভাল হত যদি আমরা যে সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসেছি সে সম্পর্কে কথা বলতাম।'

'এ কথাও আমাদের কাছে সহ্যের বাইরে।' অন্য একজন বললো, 'কেননা একজন মানুষের ইচ্ছার কাছে সমগ্র জাতির কল্যাণ ও শান্তি আমরা কুরবানী দিতে পারি না। আপনি মাত্র দুটি সেক্টর নিয়ে চিন্তিত, আমরা সমগ্র জাতির কথা চিন্তা করছি। রসদপত্রের অবস্থা আপনি নিজেই দেখছেন, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সুদানের সেক্টর থেকে আমাদের সৈন্যরা ফিরে আসছে। আমরা মনে করছি, সুদানে রসদ পৌঁছানো বন্ধ রাখা হোক। তাতে সুবিধা হবে এই যে, তকিউদ্দিন দ্রুত পিছু সরে আসবেন। তিনি যত দ্রুত সরে আসবেন ততই আমাদের সৈন্যরা মরার হাত থেকে বেঁচে যাবে।'

'এমনও তো হতে পারে, আমরা যদি রসদ না পাঠাই তবে আমাদের সৈন্যরা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে যুদ্ধ করার সামর্থ হারিয়ে ফেলবে এবং তকিউদ্দিন তাদের নিয়ে দুশমনের ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকা পড়ে যাবেন!' বললেন আল ইদরিস।

'এতেও আমি অকল্যাণের কিছু দেখি না। শুধু শুধু লড়াই করে আমাদের সৈন্যরা এখন ক্রমাগত মরছে। রসদ না পেলে তারা আত্মসমর্পণ করবে। ফলে প্রাণে বেঁচে যাবে তারা, আমরা ওদের মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়েও আনতে পারবো।'

'আপনারা কি চিন্তা করে কথা বলছেন?' আল ইদরিস বেশ রাগত স্বরেই বললেন।

'আমরা যথেষ্ট চিন্তা করেছি এবং আমাদের চিন্তা খুব স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।' উত্তরে বললো একজন, 'সালাহউদ্দীন আইয়ুবী আমাদের ওপরে সামরিক শাসন চালাতে চান। তিনি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ চালিয়ে জাতিকে বুঝাতে চান যে, জাতির শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষক শুধু সামরিক বাহিনী। জাতির ভাগ্য এখন নির্ভর করছে তাদেরই হাতে। যদি সুলতান আইয়ুবী শান্তি ও নিরাপত্তা চাইতেন, তবে একই সাথে দু'দুইটি শক্তির সাথে আগ বাড়িয়ে যুদ্ধ না বাঁধিয়ে আপোষ মীমাংসার প্রচেষ্টা চালাতে পারতেন, শান্তিচুক্তি করতে পারতেন।'

আল ইদরিস এদের কথা শুনে ছটফট করে উঠলেন। তিনি কল্পনাও করেননি, সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে এবং ক্রুসেডদের পক্ষে মিশরের মাটিতে দাঁড়িয়ে কেউ প্রকাশ্যে এ ধরনের শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। বৈঠকের পরিবেশ ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো এবং উচ্চস্বরে কথা কাটাকাটি শুরু হলো ওদের মধ্যে। কমিটির দুই সদস্য তাকে কথা বলার সুযোগই দিতে চায় না। শেষে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি এ বৈঠক বাতিল করে দিচ্ছি। আগামীকালই আমি

আজকের আলোচনা ও আপনাদের মন্তব্য লিখিতভাবে যুদ্ধ সেক্টরে মিশরের আমীরের কাছে পাঠিয়ে দিব।' তিনি রাগে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বৈঠক শেষে একজন সদস্য সাথে সাথে সেখান থেকে চলে গেল। অন্যজন, যার নাম আরসালান, বসে রইল আল ইদরিসের সঙ্গে। আরসালান বংশীয়ভাবে সুদানীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। সে আল ইদরিসকে বললো, 'আপনি ব্যক্তি পুজারী ও আবেগ দ্বারা পরিচালিত। আমি কিছু কঠিন বাস্তবতা ও নিরেট সত্য আপনার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছি, আর এতেই আপনি রেগে গেলেন। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আমার বিরুদ্ধে সুলতান সালাহউদ্দিনকে লিখবেন না. তাতে আপনারই ভাল হবে।'

তার বলার ভঙ্গি এবং স্বরে প্রচ্ছন্ন হুমকি ও চ্যালেঞ্জ ছিল। আল ইদরিস তার দিকে বাঁকা নজরে তাকালেন কিন্তু এর কোন জবাব দিলেন না।

আরসালান আবার বললো. 'আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে আমি আপনার সাথে এ নিয়ে আলাদাভাবে কথা বলবো।'

'না! তোমার যা বলার এখনই বলতে পারো।' আল ইদরিস বললেন।

'আপনি আমার বাড়িতে চলুন।' আরসালান বললো, 'বেশ রাত হয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে আমার। চলুন, এক সাথে বসে খেতে খেতে আলাপ করা যাবে। আপনার সাথে আমি কিছু জরুরী গোপন কথা বলতে চাই। আলোচনা শুনলেই বুঝবেন বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ।'

আল ইদরিস তার সঙ্গে তার বাড়িতে গেলেন। তিনি যখন বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন, মনে হলো কোন রাজা বাদশাহর মহলে প্রবেশ করছেন। কিন্তু আরসালান তেমন কোন খান্দানী বড় ঘরের লোক ছিল না।

দু'জনে বাড়ির ভেতর এক কামরায় গিয়ে বসলেন। একটু পর এক সুন্দরী যুবতী রোপোর জগ, গ্লাস ও দু'টি পিয়ালা নিয়ে প্রবেশ করলো সেখানে। মেয়েটি কামরায় এসে সবকিছু রাখল ওদের সামনে। আল ইদরিস ঘ্রাণেই বুঝে নিলেন, এ শরাবের পিয়ালা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আরসালান, তুমি তো মুসলমান! তুমি মদ পান কর?'

আরসালান হেসে জবাব দিলো, 'আপনি মাত্র এক চুমুক খেয়ে দেখেন, এর গুণ বুঝতে পারবেন।'

উর্দি পরা দুই সুদানী খানসামা ভেতরে প্রবেশ করলো। তাদের হাতে শাহী খাবারের সুদৃশ্য তৈজসপত্র, প্লেট, ডিশ। আল ইদরিস খাবারের আয়োজন দেখে অবাক বিস্ময়ে আরসালানের দিকে তাকালেন। আরসালান বললো, 'অবাক হবেন না আল ইদরিস সাহেব! এই শান শওকত, বিলাসিতা আপনিও পেতে পারেন। আমিও আপনার মত সাধারণ জীবন যাপন করতাম। কিন্তু এখন আমার জীবনধারায় যোগ হয়েছে শান-শওকত, বিলাসিতা। আমার মনোরঞ্জনের জন্য হারেমে আছে একাধিক রূপসী নারী। আমার কাছে এমন সব মেয়ে আছে যা দামেস্ক ও বাগদাদের আমীরদের ঘরেও সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। মনে রঙ ধরানো, নেশা জাগানো বিদেশী মদেরও কোন অভাব নেই আমার।'

'এইসব মেয়ে, এইসব সম্পদ ও মদের নেশা সবই ক্রুসেডদের করুণার দান?' আল ইদরিস বললেন, 'অথচ এই নারী ও মদ এখন ইসলামী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে!'

'আপনিও দেখছি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর মত কথা বলছেন।' আরসালান বললো, 'এই তো আপনার দুর্ভাগ্যের কারণ।'

'কি বলতে চাচ্ছো তুমি?' আল ইদরিস বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুমি কি আমাকেও ক্রুসেডদের জালে আটকে যেতে বলছো!'

'আমি সামরিক জান্তার গোলাম হতে চাই না।' আরসালান বললো, 'আমি সৈন্যদেরই গোলাম বানাতে চাই। তার একমাত্র পথ হলো সুদানে তকিউদ্দিনকে রসদপত্র ও সৈন্য সাহায্য না দেয়া। তাকে বরং আশ্বাস দিয়ে দিয়ে ধোকায় ফেলে রাখতে হবে। সাহায্য আসছে এই মিথ্যা আশা দিয়ে নিরাশ করতে হবে তাকে, যাতে তিনি শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। বুঝাই যাচ্ছে, সুদানীরা তাঁকে আর তার সেনাবাহিনীকে সুদানের মাটিতেই চিরদিনের জন্য কবর দিতে যাচ্ছে। আমরা সৈন্যদের পরাজয়ের দায়দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাকে জাতির কাছ হেয় প্রতিপন্ন করবো। তারপর জাতি সালাহউদ্দীনের বাহিনী থেকেও মুখ ফিরিয়ে নেবে। আপনি আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করুন। এতে আপনার আমার কোন ক্ষতি হবে না। বরং আপনাকে এর বিনিময় মূল্য যা দেয়া হবে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি।' ... ইদরিস বললেন, 'তুমি আমার ঈমানকে বিক্রি করে দিতে চাও। কি... আমার দ্বারা তা সম্ভব নয়।'

এভাবে ওদের মধ্যে আরো অনেক কথাবার্তা ও তর্ক বিতর্কের পর আল ইদরিস বললেন, 'তুমি এমনসব ভয়ংকর কথা, এত সাহস নিয়ে কি করে বলছো? তুমি কি জানো না, এর জন্য তোমাকে গাদ্দারীর অভিযোগে গ্রেফতার করা হতে পারে, বিচারে তোমার কঠিন সাজা হতে পারে?'

'আপনি ভাবছেন পারে, আমি বলছি পারে না। কারণ আমিও তো বলতে পারব, আপনি আমাকে মিথ্যা দোষারোপ করে গ্রেফতার করেছেন?' আরসালান বললো, 'সুলতান আইয়ুবী আমার বিরুদ্ধে একটি কথাও বিশ্বাস করবেন না।'

আল ইদরিস এ কথা শুনে যেমন বিস্মিত হলেন তেমনি শংকিতও হলেন। মনে মনে বললেন, এসব গাদ্দাররা এতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হলো কি করে? কত ধুরন্ধর আর ভয়ংকর হলে এসব ব্যক্তি এমন দুঃসাহস দেখাতে পারে? এরা কি আগে থেকেই গাদ্দার ছিল, নাকি দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভের পর এদেরকে গাদ্দার বানানো হয়েছে?

আল ইদরিস একজন মর্দে মোমিন ও সৎ লোক ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছেন না, মানুষ কত নীচে নামলে ঈমানকে নিলামে বিক্রি করতে পারে। এই আরসালান এক সময় খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতো, নিম্নপদে চাকরী করতো। কাজের প্রতি তার আন্তরিকতা ও যোগ্যতা দেখে তিনিই তাকে প্রমোশনের পর প্রমোশন দিয়ে এই পর্যায়ে তুলে এনেছেন।

কিন্তু তার যে এতটা অধঃপতন হয়েছে তা তিনি জানতেন না।

তিনি আরসালানকে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না তুমি যা বলছো তার কতোটা বুঝে বলছো আর কতোটা নেশার প্রভাবে। তুমি কি বলছো, আর কি করছো সে সম্পর্কে তোমার কোন ধারনা আছে কিনা? তুমি যে অপরাধে জড়িত তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি এক সপ্তাহের মধ্যে তোমার মত ও পথ পরির্তন করবে। আজ থেকে শত্রুদের সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আমি তোমাকে রসদ পাঠানোর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলাম। আগামীকাল থেকে তুমি ছুটি ভোগ করবে। আমি তোমার ছুটি মঞ্জুর করানোর দায়িত্ব নিচ্ছি। তুমি শুধু আমাকে আশ্বাস দাও, তুমি বর্তমান খেলাফতের ও তোমার জাতির অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকবে। এ সিদ্ধান্ত তোমার প্রতি আমার দীর্ঘদিনের স্নেহের ফল ও অনুকম্পা বলে ধরে নেবে।'

আরসালান আল ইদরিসের কথাগুলো শোনলেন ঠিকই, কিন্তু কোন গুরুত্ব দিলেন বলে মনে হলো না। তার অবজ্ঞামাখা চাহনির দিকে তাকিয়ে আল ইদরিস আবার বললেন, 'দেখো আরসালান, আমার কথাকে তুমি হালকাভাবে নিও না। তুমি জানো, যদি আমি প্রয়োজন মনে করি, তবে ক্রুসেডদের সাহায্যে তুমি যে আলীশান মহল গড়ে তুলেছো সে মহলেই আমি তোমাকে নজরবন্দী করে রাখতে পারবো। সাতদিন যথেষ্ট লম্বা সময়। যেন এমন না হয়, অষ্টম দিনে তোমাকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে জল্লাদের হাতে তুলে দিতে হয়।'

আল ইদরিস উঠে দাঁড়ালেন, দেখলেন আরসালান হাসছে।

'মুহত্যারাম আল ইদরিস!' অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললো আরসালান, 'আপনার দুটি সন্তান আছে। দুজনই যুবক!'

'হ্যাঁ! তো কি হয়েছে?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন আল ইদরিস।

'কিছুই না।' আরসালান উত্তরে বললো, 'আমি আপনাকে শুধু স্মরণ করিয়ে দিলাম, আপনার দুটি সন্তান আছে এবং দুজনই যুবক। আর এরাই আপনার একমাত্র বংশধর।'

আল ইদরিস এ কথার কোন মর্ম উদ্ধার করতে পারলেন না। তিনি তাকে বললেন, 'শরাব তোমার মাথা খারাপ করে দিয়েছ।' এটুকু বলেই তিনি বাইরে চলে গেলেন।

আরসালানের মহল থেকে বেরিয়ে আল ইদরিস সোজা আলী বিন সুফিয়ানের বাড়িতে চলে এলেন। তিনি তাকে আরসালানের সব কাহিনী খুলে বললেন। আলী বিন সুফিয়ান তাঁকে বললেন, 'আরসালানের নাম আমার সন্দেহ খাতাতে তালিকাভুক্ত আছে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাইনি। গোয়েন্দারা তার ওপর নজর রাখছে।'

আরসালানের মহল থেকে প্রচণ্ড অস্থিরতা ও অশান্ত মন নিয়ে বেরিয়েছিলেন আল ইদরিস। আলী বিন সুফিয়ানের সন্দেহভাজনদের তালিকায় তার নাম আছে এ কথা শুনে কিছুটা শান্ত হলেন তিনি। বললেন, 'কিন্তু আরসালান গাদ্দারী করছে এটা কি কল্পনা করা যায়?'

আলী বিন সুফিয়ান তাকে বললেন, 'শুধু সে একলা নয়, দেশে বিশ্বাসঘাতকদের একটি সংঘবদ্ধ দল আছে। আর এর বিষ সেনাবাহিনীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।'

আলী বিন সুফিয়ানের এ কথায় তার মনে যে প্রশান্তিটুকু এসেছিল তা নিমিষেই উধাও হয়ে গেল। আল ইদরিস তাঁকে বললেন, 'আমি আরসালানকে সুদানের সেনা সেক্টরে রসদ পাঠানোর দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেছি। রসদ পাঠানোর দায়িত্ব এখন নিজেই পালন করবো ভাবছি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে জিনিসপত্রের সংকট নিয়ে।'

আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'ষড়যন্ত্রকারীরা অত্যন্ত সুকৌশলে দেশের পল্লী অঞ্চলের খাদ্যশস্য ও দুম্বা-বকরী দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তারাই হাটবাজারে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের একটি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে।'

'এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।'

'হ্যাঁ, এ জন্য গোয়েন্দা বিভাগকে তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ওরা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এ কাজে। তাদের বলে দেয়া হয়েছে, কেউ খাদ্যশস্যের একটি দানাও বাইরে পাচার করছে দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন তাকে পাকড়াও করা হয়।'

দীর্ঘ আলোচনার পর ওরা রসদ পাঠাবার একটা পথ খুঁজে বের করলেন।

আল ইদরিস এই কঠিন মিশনের দায়িত্ব পালনে এতটাই মনোনিবেশ করলেন যে, মন থেকে আরসালানের কথাও

বেমালুম ভুলে গেলেন। আরসালান বলেছিল, আপনার দু'টি যুবক ছেলে আছে এবং ওরাই আপনার বংশ রক্ষক। কিন্তু কেন সে এ কথা বলেছিল তা তিনি বুঝেননি।

সন্তানদের ব্যাপারে আল ইদরিসের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। কারণ তারা কেউ বখে যাওয়া সন্তান ছিল না। বংশের সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখেই ওরা এতটা বড় হয়েছে। পাড়াপড়শি তাদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে। কায়রো শহরের অভিজাত সমাজে তারা সজ্জন হিসাবে সুপরিচিত। তিনি সন্তানদের নিয়ে বরং গর্ব ও গৌরব বোধ করেন।

সুলতান আইয়ুবীর অবর্তমানে কায়রো শহরে পাপের যে স্রোত বয়ে যায়, সে স্রোতে কেবল সাধারণ মানুষই ভেসে যায়নি বরং তাদের চেয়েও বেশি ভেসেছে ধনীর দুলাল ও অভিজাত শ্রেণী। বাইরে থেকে দেখতে শহরটা হয়তো সুন্দরই দেখা যেতো, কিন্তু এই আপাত-সুন্দরের অভ্যন্তরে অন্ধকারের যে কুৎসিত একটা বিশাল জগত গড়ে উঠেছিল, সমাজের সৎ ও ভাল লোকদের চোখে তা ধরা না পড়লেও আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বাহিনীর চোখে তা ঠিকই ধরা পড়েছিল।

গাছে ঝাকি দিলে যেমন টসটসে পাকা ফল টপাটপ নিচে পড়তে থাকে তেমনি যে সব যুবকদের নিয়ে অভিভাবকরা গর্ব করতো সেই সব সোনার ছেলেগুলো টপাটপ ঢুকে যাচ্ছিল এই অন্ধকারের সাম্রাজ্যে। খৃস্টানরা এমনসব জায়গায় এমনসব ফাঁদ পেতে রেখেছিল যে, পতঙ্গের মতই যুবকরা ঝাঁপিয়ে পড়ছিল সেই ফাঁদে। মুষ্টিমেয় হুশিয়ার যুবক ছাড়া উঠতি তরুণ ও যুবকরা হারিয়ে যাচ্ছিল যৌবনের মৌ বনে। ভাল

ভাল কথা, সৎ উপদেশ, মুরুব্বিদের পরামর্শ এসব এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যেতো। কিন্তু সেই কানেই মধু বর্ষণ করতো চুড়ির সামান্য রিনিঝিনি, পানপাত্রের টুং টাং মৃদু আওয়াজ। যৌবন কালটা যে বড় বেয়াড়া ও অন্ধ হয়, সময়মত তাকে নিয়ন্ত্রণ না করলে জীবন তছনছ হয়ে যায়, এ কথা তাদের তখন কে বুঝায়!

দু'তিন বছর আগেও এমনি একটি স্রোত এসেছিল কায়রোয়। তখন সুলতান ছিলেন এখানে। শুরুতেই সুলতানের নজরে পড়ে যায় ব্যাপারটি। মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার আগেই সুলতান খুব দ্রুত তা নির্মূল করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। ফলে সে স্রোতের গতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু আজকের অবস্থা ভিন্ন। সুলতান নেই, সুলতানের ভাই তকিউদ্দিনও নেই। কে রুখে দাঁড়াবে এ স্রোতের বিরুদ্ধে?

এ স্রোত মহামারীর মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। খেল তামাশার মধ্য দিয়ে সবার অলক্ষ্যে এ মহামারী প্রবেশ করছে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বাহন হিসাবে ব্যবহার করছে মদ, জুয়া, নাচ, গান এইসব। এ মহামারীর কাজ একটাই, নৈতিকতার বাঁধন শিথিল করা এবং এর মাধ্যমে মুমীনের ঈমান ক্রয় করা।

নৈতিকতার বাঁধন শিথিল করার এ খেলা শুরু হয়েছিল বড় বড় তাবু ও সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে প্রদর্শনী দেখানোর মধ্য দিয়ে। প্রদর্শনীতে হয়তো আপত্তিকর উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু

থাকতো না। কিন্তু প্রদর্শনীর পাশে থাকতো নানা রকম জুয়ার আড্ডা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আসর বসতো গাঁজা ও আফিম সেবনের। ছামিয়ানার মধ্যে আবার গোপন তাবু থাকতো। সেই সব তাবুতে যুবকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য থাকতো ভ্রাম্যমান দালাল। তারা ইশারা ইঙ্গিতে আহ্বান জানাতো যুবকদের। পয়সার বিনিময়ে তাদের নিয়ে যেতো তাবুর ভেতর। তাবুতে থাকতো কাপড়ের ওপর আঁকা বড় বড় রঙিন ছবি। এসব ছবি থাকতো উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ এবং যৌন আবেদনমূলক। ছবি দেখানোর কাজ করতো মেয়েরা। তাদের মুখে থাকতো হাসি, চোখে প্রচ্ছন্ন আহ্বান। অঙ্গভঙ্গিতে থাকতো যুবকদেরকে পাপের পথে নামানোর ইঙ্গিত।

যারা ধনাঢ্য তারা পয়সা দিয়ে ঢুকে যেতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাবুতে। সেখানে তাদেরকে মদ পরিবেশন করা হতো। নর্তকী নাচ দেখাতো, গায়িকারা গান গাইতো আর মনোরঞ্জন করতো সেই ধনীর দুলালদের। এসব নির্লজ্জ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে বাঁধা দেয়ার কেউ ছিল না।

প্রথম দিকে প্রদর্শনীর নামে ভেতরে আসলে কি ঘটছে সমাজ ও সরকার তা জানতে পারতো না। কারণ, যে একবার উলঙ্গ ছবি দেখতো বা মদ খেয়ে বাঈজী নিয়ে ফুর্তি করতো সে ওখানে কি করেছে এ কথা শরমে কাউকে বলতে পারতো না। তবে একবার এই পাপের স্বাদ ও আকর্ষণ যে পেয়েছে সে বার বার ওখানে যেতো। সে বাইরে কারো কাছে এ কথা প্রকাশ করত না এই জন্য যে, যদি ব্যাপারটা সরকারের কানে যায় তবে এ নেশা ও আনন্দ থেকে তাকেই যে চির বঞ্চিত

হতে হবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই আনন্দ ও নেশার শিকার হতো উঠতি বয়সের কিশোর, এক শ্রেণীর যুবক ও সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য।

যারা এই কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল তাদের মিশন কি পরিমাণ সাফল্য লাভ করতো তা জার্মান বংশোদ্ভূত যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ ক্রুসেড নেতা হরমন তার শাসককে নিয়মিত রিপোর্ট করতো।

এসব ছবি আসতো স্পেন থেকে। স্পেনের শিল্পীরা এমন সব ছবি বানাতো, যে ছবি কঠিন সংযমী মানুষের সংযমকেও ভেঙে চুরমার করে দিতো। ক্রুসেডের সাথে জড়িত খৃস্টানরা অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে পরিকল্পিতভাবে এসব ছবি তৈরী করিয়ে প্রদর্শনীগুলোতে পাঠাতো।

একজন শিল্পী একটি যুগল ন্যূড ছবি নিয়ে এল হরমুনের কাছে। ছবিটি ছিল বেশ বড় সাইজের জলরঙের পেইন্টিং। শিল্পী অত্যন্ত নিপূণভাবে ব্রাশ ও তুলির প্রতিটি আঁচড়ে ছবিটিকে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছে। উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার এবং বিরল একটি অশ্লীল পোজের কারণে ছবিটির দিকে একবার তাকালে সহজে চোখ ফেরানো যেতো না। ছবিটি দেখে খৃস্টান শাসকরা একে অপরের সাথে উলঙ্গ রসিকতা শুরু করে দিল।

হরমন বললো, 'আমি এখন এ ধরনের অসংখ্য ছবি বানিয়ে মিশরের বড় বড় শহরগুলোতে গোপন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিয়েছি। সেখান থেকে আমাদের কাছে সফলতার সংবাদ

আসছে। আমি কায়রোর নব্য যুকদের মধ্যে নগ্নতা ও পশুত্বের এমন বিস্তার ঘটাবো যেন তারা পাগলপারা হয়ে যায়। এমন উন্মাদনা সৃষ্টি করবো, যাতে তাদের যারতীয় মানবিক বোধ-বুদ্ধি, আবেগ ও প্রেরণা ধ্বংস হয়ে যায়। জাতীয় কর্তব্যবোধ, ধর্মীয় নৈতিকতা ও ঐতিহ্যের প্রেরণা– সবকিছুই তারা এ আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে ডুবে থাকবে মওজের মাহফিলে।'

'কি রকম সাফল্য পাচ্ছো এ অপারেশনে?' জানতে চাইল একজন।

'খুবই আশাব্যঞ্জক। এসব ছবি মিশরের স্থানীয় মুসলমান ও সৈনিকদের মানসিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে প্রদর্শনী ততই জমজমাট হয়ে উঠছে। ভীড় বাড়ছে। অনেক যুবক এসব ছবি কিনে নিয়ে ঘর সাজাচ্ছে ওদের। দরজা বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবি দেখছে আর দল বেঁধে নেশা করছে।

আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা মরুভূমির বেদে ও যাযাবর মেয়েদেরকে অর্থের বিনিময়ে সমস্ত কায়রো শহরে ছড়িয়ে দিয়েছে। সেনানিবাসের আশপাশেই ভীড়টা ওদের বেশি। উপশহর ও শহরতলীতে অনেকগুলো বাসা ভাড়া করে দিয়েছি ওদের জন্য। এই মেয়েরো উঁই পোকার মত সুলতান সালাহউদ্দিনের ঈমানদার জাতি ও সেনাবাহিনীকে খেয়ে শেষ করছে।'

'কোন সমস্যা হচ্ছে না?'

'প্রথম দিকে কিছুটা হয়েছিল। আমার এ মিশনে যারা

কাজ করছে তাদের কেউ কেউ ধরা পড়েছিল। পরে আমি টেকনিক বদল করি। এখন সেখানকার মুসলমানরাই আমার মিশন চালু রাখতে সাহায্য করছে। যারা এ বিষে একবার আক্রান্ত হয়েছে আমরা এখন তাদের ব্যবহার করছি। এ হচ্ছে এক ছোঁয়াচে রোগ। আর রোগ সব সময়ই মহামারীর মত ছড়িয়ে যায়। কায়রোয় এখন সে মহামারী শুরু হয়েছে।

কট্টর মৌলবাদী যারা, তাদের ছেলে মেয়েরাও রেহাই পাচ্ছে না এ মহামারীর ছোবল থেকে। নিষিদ্ধ দুনিয়ার আকর্ষণে বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাচ্ছে তারাও। তারা এখন মানসিক দিক থেকে এই বিলাসিতার অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মন মগজ থেকেও এই বিষ সব রকম দেশপ্রেম আর ঈমানকে নষ্ট করে দেবে। ওইসব মুসলমানরাই তখন নিজেদের সুখ সম্পদের অন্তরায় ভেবে ইসলামকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অন্তরায় মনে করে বিরোধিতা করবে ইসলামের। কাজ যা করার ওরাই করবে. আমরা শুধু এ আগুন যাতে নিভে না যায় সে জন্য বাতাস দিয়ে যাবো।'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খুবই হুশিয়ার ব্যক্তি।' বৈঠকে উপস্থিতদের মধ্যে একজন বললো, 'তিনি যখন মিশরে উপস্থিত হবেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তোমার মিশন মূলসহ উপড়ে ফেলতে চেষ্টা করবেন বলে কি তুমি মনে করো?'

'যদি সে মিশরে পৌঁছতে পারে তবে তো!' হরমন বললো, 'সে মিশরে আর কোন দিন ফিরে আসতে পারবে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর তো আপনাদের কাছে। আমার কাজ

তো গোয়েন্দা তৎপরতা আর নাশকতামূলক কাজেই সীমাবদ্ধ। আপনারা যারা সরাসরি আইয়ুবীর মোকাবেলা করছেন তারা কি মনে করেন আমাদের এত পূর্ব প্রস্তুতির পরও সে ক্রাকের অবরোধ থেকে ফিরে আসতে পারবে?'

'দুদিন আগে হলেও এর উত্তরে আমি কোনরকম চিন্তা ছাড়াই না সূচক জবাব দিতাম। কিন্তু আজ এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে ভেবেচিন্তে দিতে হবে। আমরা আইয়ুবীর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য রিমাণ্ডের নেতৃত্বে যে বিশাল বাহিনী মরুভূমিতে লুকিয়ে রেখে ভাবছিলাম আইয়ুবীর যুদ্ধের নেশা চিরতরে মিটিয়ে দেবে এ বাহিনী, সে আশা আমাদের দুরাশায় পরিণত হয়েছে। আক্রমণ করার মুহূর্তে রিমাণ্ড হয়তো ভাবছিল, বাগান থেকে খেজুর পাড়ার মত সহজ হবে আইয়ুবীর ঘুমন্ত সৈনিকদের হত্যা করা। কিন্তু তার হয়তো মনে ছিল না, আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে যে আইয়ুবী জয়ী হয়েছে এবারও যুদ্ধ পরিচালনা করছে সে নিজে। এখন ফাঁদে আটকে পড়া ইঁদুরের মত নিজের বাহিনীর একটা বড় অংশকে হারিয়ে পাহাড়ের খাঁজে ভীতবিহ্বল হয়ে ছুটাছুটি করা ছাড়া রিমাণ্ডের আর কোন কাজ নেই। ওদিকে আইয়ুবী দুর্গের অবরোধ আরো মজবুত করেছে। ফলে বাইরে থেকে দূর্গে খাদ্য ও রসদ পাঠানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় অবরোধ দীর্ঘ হলে পরিস্থিতি আমাদের জন্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে।'

'কিন্তু এই ঘেরাও এবং অবরোধ তাঁর নিজের জন্যও ক্ষতির কারণ হতে পারে। আপনারা শুধু তাকে কয়েকটা দিন

ওখানে আটকে রাখুন, সুদানী বাহিনী তকিউদ্দিনকে তাড়িয়ে নিয়ে ছুটে আসছে মিশরের দিকে। আইয়ুবী ওখানে আটক থাকলে মিশর তার হাত ছাড়া হবে এবার। তখন তার পায়ের তলে আর কোন মাটি থাকবে না।'

'হ্যাঁ, যুদ্ধের মোড় কখন কোন দিকে ঘুরে যায় তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আপনার বিশ্লেষণও সত্য হতে পারে।'

'পারে না শুধু, এটা এবার হতেই হবে। মিশরের জনগণই এবার আইয়ুবীকে গদিচ্যুত করবে। সে পরিবেশ আমরা প্রায় তৈরী করে এনেছি। হাট-বাজার থেকে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উধাও করে দিয়েছি। দেশে দুর্ভিক্ষ লাগতে আর বেশি বাকী নেই। এ জন্য জনগণ আইয়ুবীকেই দায়ী করবে। সেনাবাহিনীর রেশন কমিয়ে দেয়ার ফলে ওখানেও যে কোন সময় বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।'

'সরকারী আমলা ও অফিসারদের ক্রয় করার অবস্থা কি?'

'আপনাদের দেয়া অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে। আইয়ুবীর অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত হাকিম আরসালান এখন পুরোপুরি আমাদের হয়ে কাজ করছে। সে এ কাজে এরই মধ্যে আরো বেশ কিছু সঙ্গী সাথীও জোগাড় করে নিয়েছে।'

'আরসালানকে কেমন বেতন দেয়া হচ্ছে?' জানতে চাইল ফিলিপ আগাস্টিন।

'একজন মুসলমান হাকিমের মাথা কেনার জন্য যত অর্থ দরকার তা ব্যয় করতে আমরা কার্পণ্য করছি না।' হরমন উত্তর করলো, 'মদ, নারী, ধন, সম্পদ ও শাসন ক্ষমতার নেশা যদি কোন মুসলমানের ঈমান খরিদ করতে পারে, তবে আমি

তাকে খরিদ করেছি।'

'তাহলে বলতেই হয়, সালাহউদ্দিন যে মিশর দেখে গিয়েছিল সে মিশরের চেহারা এখন আমূল পাল্টে গেছে।' বলল আরেক নাইট। 'তিনি যে ভবিষ্যত বংশধরদের নিয়ে গর্ব করতেন, তারা মুসলমান থাকলেও ইসলামের পক্ষে থাকবে না। তাদের চিন্তা ও কর্মধারা থাকবে সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে। তার মানে মিশর হয় আমাদের থাকবে অথবা আমরা যাদের মদদ দেবো সেই মুসলমানদের হাতে।'

'জ্বী, আইয়ুবীর সাথে মুখোমুখি লড়াইয়ে আপনাদের বাহিনী বারবার পরাজিত হলেও আমার বাহিনী শুরু থেকেই বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করছে। আমার বাহিনী মুসলমানদের এমন জায়গায় নিয়ে যাবে, যেখানে গেলে আপনাদের আর মুখোমুখি লড়াই করার কোন প্রয়োজনই পড়বে না। এরই নাম সাংস্কৃতিক যুদ্ধ, এখানে মুজাহিদদের তীর এবং তলোয়ার কোন কাজ দেবে না।

আমি আপনাদের হাতে এমন এক মিশর তুলে দেবো যেখানে আদমশুমারীতে লাখ লাখ মুসলমান থাকবে, কিন্তু একজন মানুষ, যে বিশ্বাস ও কাজ করলে তাকে আসলে মুসলমান বলা যায়, ইসলামের ধারক বাহক তেমন কোন মুসলমান আপনারা সহজে খুঁজে পাবেন না। ফলে আপনাদের আর যুদ্ধও করতে হবে না, পরাজয়েরও কোন প্রশ্ন আসবে না।'

'তাহলে তো বলতে হয় আমাদের ছাড়াই আপনি যুদ্ধ শেষ করে এনেছেন! যে মুসলমানের কাছে ইসলাম নেই তার

সাথে আমাদের শত্রুতাও নেই, কি বলেন?'

'ঠিক, ঠিক।' সবাই সমস্বরে সায় জানাল এ কথায়।

হরমনের এই আশাপ্রদ রিপোর্টে শাসকশ্রেণী খুব খুশি হলো। ফিলিপ অগাস্টাস সেই সংকল্প আবার ব্যক্ত করলো, যে কথা সে আগেও কয়েকবার বলেছে, 'আমাদের যুদ্ধ সালাহউদ্দিনের সাথে নয়, ইসলামের সাথে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবীও মারা যাবে, আমরাও মারা যাব। কিন্তু আমাদের এই আবেগ, প্রচেষ্টা ও উদ্যম চিরদিন সতেজ ও জীবিত থাকা প্রয়োজন। ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলা এবং সারা বিশ্বে খৃস্টান শাসন প্রতিষ্ঠিত করা ও তা টিকিয়ে রাখার কথা চিন্তা করতে হবে আমাদের। এ জন্য প্রয়োজন এমন সেক্টর খোলা, যেখান থেকে ইসলামী আদর্শের ওপর আঘাত হানা যায়। মুসলমানদের রাখতে হবে ঘুমের জগতে। কি হারিয়েছে তারা, যেন তা টের না পায়। ইসলামের নির্দেশিত পথে না চলেও ওরা যেন ভাবতে পারে ওরা মুসলমান।'

'তাই তো! আসলে মুসলমান তো সে, যে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজের জীবন চালায়। যার ঈমান ও আমলে মিল নেই সে আবার মুসলমান কিসের?' উল্লসিত হয়ে বলল একজন।

'কিন্তু এ কথা তাদের বলা যাবে না। তাদের বলতে হবে, মুসলমানের কাজ হলো আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং হযরত মুহাম্মদকে ভক্তি করা। 'ঈমান ও আমল' ভিন্ন এ কথা বললে তারা ক্ষেপে যেতে পারে, তাদের বলতে হবে 'ধর্ম আর জীবন আলাদা', তাহলেই আর কোন সমস্যা থাকবে না।' বলল

ফিলিপ অগাস্টাস।

'হ্যাঁ, বলতে হবে, ধর্ম পালন করা যার যার ব্যক্তিগত রুচি, সামর্থ এবং সময়ের ব্যাপার। এভাবে 'ইসলাম' ও 'মুসলমান'কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। কোরআন ও হাদীস থাকবে তাকের ওপর, বড়লোকের শোকেসের শোভা বাড়াবে ওসব কিন্তু তার আলোকে জীবন না চালিয়েও দিব্বি মুসলমান থেকে যাবে সবাই।' বললো এক সেনাপতি।

ফিলিপ অগাস্টাস বললো, 'আমি হরমনকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, তিনি যে লড়াই শুরু করেছেন সেটাই আমাদের মূল লড়াই। সাময়িক সাফল্য নয়, এ লড়াইয়ের সাফল্য হবে স্থায়ী ও পরিপূর্ণ।'

আল ইদরিসের দুই ছেলেই যুবক। একজনের বয়স সতেরো ও অন্য জনের একুশ। আল ইদরিস যেমন জানেন না নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত খৃস্টানদের তৎপরতার খবর, তেমনি জানেন না তার সন্তানরা কেউ অন্ধকার জগতে পা দিয়েছে কিনা! কায়রো শহরের দৃশ্যমান রূপের বাইরে আরো যে একটি রূপ আছে, যে রূপের খবর প্রতিটি যুবকের কাছে নিয়মিত পৌঁছে যায়, সে খবর তার জানা নেই। কেউ কখনো তাকে এ কথাও বলেনি যে, তোমার সন্তানরা আনন্দ স্ফূর্তির নামে পঙ্কিলতার প্লাবনে গা ভাসিয়েছে! ফলে সন্তানদের নিয়ে তিনি বেশ নিশ্চিন্ত আছেন।

এরই মধ্যে ঘটে গেল এক ভয়ংকর ঘটনা। তার বড় ছেলে হিশাম লেখাপড়া শেষ করে সম্প্রতি ব্যবসায় ঢুকেছে।

দুপুরে বাসায় ফিরছিল খাওয়ার জন্য, একটি মেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল তার কাছে। বলল, 'প্লিজ, আমাকে একটু হেল্প করবেন?'

মেয়েটির চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। সে দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার! কি করতে পারি আমি আপনার জন্য?'

'একটা লোক আমাকে উত্যক্ত করছে। আমি যেদিকে যাই সে আমার পিছু নিচ্ছে। আমি খুব ভয় পাচ্ছি। আমাদের বাড়ি খুব দূরে নয়, ওই সাহেব পাড়ায়। আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন?'

'ঠিক আছে, চলুন।'

সাহেব পাড়াটা কায়রোর অভিজাত এলাকা। আল হিশামকে ওই পথেই বাড়ি ফিরতে হয়। মেয়েটি হিশামের পাশাপাশি মাথা নিচু করে হাঁটছিল। হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'আপনাকে কি বিপদেই না ফেলে দিলাম!'

'না, না, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। আমি তো এ পথেই বাড়ি ফিরছিলাম।'

'আপনার বাসা কোথায়?'

'হাকিম পাড়া।'

'হাকিম পাড়া!' মেয়েটি উৎসাহিত গলায় বলল, 'কোন বাড়ি আপনাদের?'

'আমি হাকিম আল ইদরিসের ছেলে।'

'আমি শায়লা। আবু আল আমর আমার আব্বা। আপনি?'

'আমার নাম হিশাম। লেখাপড়া শেষ করে চকে ব্যবসা শুরু করেছি।'

এভাবেই পরিচয় ঘটে ওদের। আবু আল আমর একজন কুটনীতিবিদ। বিদেশীদের সাথে তার দহরম মহরম। সেই সুবাদেই হয়তো ওদের পরিবারে বিদেশী হাওয়া ঢুকেছে। মুসলমান হলেও মেয়েটার বেশভূষা খৃষ্টানদের মত, একেবারেই বেপর্দা।

কথা বলতে বলতে একসময় ওরা শায়লাদের বাড়ির গেটে এসে পৌঁছল। হিশাম বিদায় নিতে চাইলে কিছুতেই ওকে যেতে দিল না শায়লা, হিশামকে নিয়ে অন্দরে ঢুকে গেল। বাড়িটি প্রাসাদোপম। আসবাবপত্র সব জাকজমকপূর্ণ ও জৌলুসময়। সর্বত্র আভিজাত্যের ছোঁয়া।

শায়লা বলল, 'আজ আপনি আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছেন। এ জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি খুব স্বাধীন ও খোলমেলা টাইপের মেয়ে। আপনার সাথে আমার কতক্ষণেরই বা পরিচয়. অথচ আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার যুগ যুগান্তরের পরিচিত। আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাইবো।'

হিশাম অবাক হয়ে বলল, 'কি জিনিস!'

'মাঝে মধ্যে আপনি আপন মনে করে আমার এখানে আসবেন আর অনুমতি হলে আমি আপনার দোকানে যাবো।'

'এতে আবার অনুমতি লাগে নাকি?'

পরদিন মেয়েটি তার দোকানে এসে উপস্থিত। বিদায় নেয়ার সময় বলল, 'বাড়ি যাওয়ার সময় অবশ্যই আমার

ওখানে একটু ঢু মেরে যাবেন। আপনার জন্য একটি চমৎকার উপহার আছে, ওটি নিয়ে যাবেন।'

'কি উপহার!' অবাক হয়ে জানতে চাইল হিশাম।

'সেটি বলা যাবে না; আগে আসেন, দেখতে পাবেন।' বলে চোখে একটা কটাক্ষ হেনে বেরিয়ে গেল শায়লা।

হিশামের যাওয়ার তেমন ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মেয়েটির কটাক্ষ ও হাসি বার বার তার হৃদয়ে এসে আঘাত হানল। রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার পথে শায়লাদের বাড়ির কাছে এসে থেমে গেল তার পা। ওই হাসি ও কটাক্ষ দেখার অদম্য একটা লোভ তাকে টেনে নিয়ে গেল শায়লার কামরায়।

শায়লা আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে ভেতরে টেনে নিল। পরণে তার রাতের পাতলা পোশাক। হিশামের সামনে সে পানপাত্র এগিয়ে ধরল। ও বলল, 'আমি তো মদ খাই না!'

'এটা মদ তোমাকে কে বলল, এ তো ফ্রান্সের সেই বিখ্যাত শরাব, যা কেবল রাজা-বাদশাদের ভাগ্যেই জোটে। এ খেলে তোমার নেশা হবে না, শরীর ও মনে নতুন স্ফুর্তি আসবে। পৃথিবীটা মনে হবে অনেক সুন্দর। যা দেখবে তাই ভাল লাগবে, মনে হবে তোমাকে সুখী করার জন্য সমগ্র প্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে সুর মুর্চ্ছনা। তুমি এক ঢোক খেয়ে দেখো, ভাল না লাগলে আর খেয়ো না।'

মেয়েটি তার মুখের কাছে তুলে ধরল পানপাত্র, ঠোঁট ফাঁক করল হিশাম।

'কি, কেমন লাগলো?'

'ভাল।'

'ভাল না, বলো তোমার ঠোঁটের মত মিষ্টি।'

'তুমি কি আমার জন্য এ উপহারের কথাই বলেছিলে?'

'আরে না, উপহার হিসাবে কি তোমাকে আমি এত সামান্য জিনিস দিতে পারি! সেদিন দুর্বৃত্তের হাত থেকে তুমি যে সাত রাজার ধন রক্ষা করেছিলে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সে জিনিস আমি তোমার হাতেই তুলে দেবো। কি, বুঝতে পেরেছো?' বলেই কটাক্ষের বাণ হানলো শায়লা।

স্তম্ভিত হিশাম অবাক বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল বিমুগ্ধ নয়নে, যেন এই মাত্র মধুবর্ষী কোকিলেরা বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে। এরপর থেকে গোপনে তাদের মেলামেশা নিয়মিত চলতে লাগল।

যেদিন আরসালান আল ইদরিসকে তার যুবক সন্তানদের কথা বলেছিল তার পরের দিনই শায়লার সাথে পরিচয় ঘটে আল হিশামের।

'এক যুবক আমাকে খুব বিরক্ত করছে।' একদিন অন্তরঙ্গ এক মুহূর্তে হিশামকে বলল শায়লা : 'ছেলেটা আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছে, ওর প্রস্তাবে সাড়া না দিলে ও আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।'

'যুবকটি কে?' জানতে চাইল হিশাম। শায়লা এর কোন জবাব না দিয়ে এড়িয়ে গিয়ে বললো, 'না থাক, যদি বেশি বিরক্ত করে তবে বলবো।'

যেদিন সন্ধ্যায় হিশামের কাছে এই অভিযোগ করলো শায়লা, ঠিক তার আগের দিন আল ইদরিসের ছোট ছেলে, যার বয়স মাত্র সতেরো, তাকেও জালে আটকে ফেলে

মেয়েটি। প্রথম দিনেই তার কাছে এমন খোলামেলা প্রেম নিবেদন করলো যে, যুবকটি পতঙ্গের মত নিজেকে ছেড়ে দিলো তার ইচ্ছার কাছে। গোপনে দুদিন মেলামেশার পর তাকেও বললো, 'এক যুবক আমাকে খুব বিরক্ত করছে এবং কিডন্যাপ করার হুমকি দিচ্ছে।'

মুহূর্তে তার রক্ত গরম হয়ে উঠলো। বললো, 'ছেলেটা কে, কোথায় থাকে? আমাকে সব খুলে বলো। আমি সে বদমাইশের বদমাইশি করার সাধ জন্মের মিটিয়ে দেবো।'

'বাব্বাহ! সাহেবের যা মেজাজ! একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে দেখছি। ঠিক আছে বাবা, আজ আর বলে কাজ নেই, যদি ছোড়া আবারও বিরক্ত করে তবে ঠিকই তার ঠিকানা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো। তখন বাছাধন বুঝবে, মেয়েদের পেছনে ঘুর ঘুর করার মজা কত!'

সে রাতেই মেয়েটি যখন হিশামের সাথে মিশলো তখন বললো, 'ছেলেটি আমাকে খুব বেশি বিরক্ত করছে। তোমাকেও খুন করার হুমকি দিয়েছে। তুমি একটু সাবধানে চলাফেরা করো।'

পরের দিন যখন হিশামের ছোট ভাইয়ের সাথে মিলিত হলো তখন বললো, 'ছেলেটা আবারও আমাকে উত্যক্ত করতে এসেছিল। আমি তাকে বলেছি, খবরদার, আমার একজন ভালবাসার মানুষ আছে, তুমি বেশি বিরক্ত করলে আমি কিন্তু সবকিছু তাকে বলে দেবো। ও বলে কি জানো! বলে, আমি তো তোমার ছায়া। তুমি যেখানেই যাও, আমিও সেখানে যাই। কখনো আমাকে দেখতে পাও, কখনো পাও না। তোমার

ভালবাসার ছেলেকে আমি চিনি, ওকে তোমার কাছ থেকে সরে যেতে বলো, নইলে তাকে আমি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবো। আলম, তুমি খুব সাবধান থেকো। আমার ভয় হচ্ছে, ও না আবার তোমার কোন ক্ষতি করে বসে!'

হো হো করে হেসে উঠল আলম। 'ঠিক আছে, ওকে বলো, পারলে সে চেষ্টা একবার করে দেখতে। কিন্তু ধমক দিয়ে আমাকে সরানোর চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না।'

এভাবে দুই ভাই একই মেয়ের জালে আটকা পড়ে গেল। দু'জনের কেউ আসল সত্য সম্পর্কে কিছুই জানতে পারল না, শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী অদৃশ্য শত্রুকে খুন করার নেশায় ধারাল ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। মেয়েটি দুই ভাইয়ের সাথেই আলাদাভাবে প্রেমের অভিনয় করে যেতে লাগলো সমান তালে। সপ্তাহ শেষে দেখা গেল, ব্যবসার প্রতি কোন মনোযোগ নেই বড় ভাইয়ের, আর ছোট ভাই লেখাপড়া লাটে তুলে বন্য জন্তুর মত হিস্র পশু হয়ে উদভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের অলিগলিতে।

একদিন সন্ধ্যায় মেয়েটি হিশামকে শহর থেকে একটু দূরে তাদের যে খেজুর বাগান আছে ওখানে জরুরীভাবে দেখা করতে বললো। তারপর এল ছোট ভাইয়ের কাছে। তাকেও ঠিক একই সময়ে একই জায়গায় দেখা করার কথা বললো মেয়েটি।

'ওখানে কেন?' জানতে চাইল আলম।

'সেই ছোকরা এখনো আমার পিছু ছাড়েনি। বলেছে, আজ আমি যেখানেই যাবো আমাকে অনুসরণ করবে সে। আর

আমি যদি আমার পছন্দের প্রেমিকের সাথে দেখা করি তাহলে আমার সামনেই আমার প্রেমিককে হত্যা করবে। আমি তাকে বলেছি, তুমি যদি এতই বীর হও তবে সন্ধ্যায় আমাদের খেজুর বাগানে এসো। যদি তুমি তাকে হত্যা করতে পারো তবে আমি চিরদিনের জন্য তোমার হয়ে যাব। আর যদি না পারো তবে কোনদিন আর তুমি আমাকে বিরক্ত করতে পারবে না। কিন্তু আলম, আমার ভয় হচ্ছে, তোমার যদি কোন বিপদ হয়! নাকি না করে দেবো ওকে আসতে?'

'কি যে বলো! এই দিনটার জন্যই তো এতদিন ধরে আমি অপেক্ষা করছি। তোমার প্রেমই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে, এ নিয়ে তুমি কোন চিন্তা করো না।'

'এলাকাটা নির্জন। সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। আমার যেতে ভয় করছে।'

'তুমি কিচ্ছু ভেবো না। তুমি রওনা হওয়ার পর আমি ধারেকাছেই থাকবো এবং তোমাকে পাহারা দেবো।'

শায়লা হিশামকেও ঠিক একই কথা বলেছিল। দুই ভাই প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুন করে প্রিয়াকে আপন করে পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে রক্তাক্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল।

সন্ধ্যায় বড় ভাই খঞ্জর হাতে নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। সূর্য ডুবেছে এইমাত্র। বাগানটিকে ঘিরে ফেলেছে অন্ধকার। হিশামের মনে হলো, প্রতিটি গাছের গোড়ায় একজন করে ঘাতক ওঁৎ পেতে বসে আছে।

মেয়েটি ওখানে পৌছে দেখতে পেলো হিশাম আগেই এসে পৌঁছেছে। শায়লা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো, 'যাক বাবা,

তুমি এসে গেছো! আমার বুকটা এখনো ধড়ফড় করছে। শয়তানটাকে দেখলাম আমাকে অনুসরণ করে পিছু পিছু আসছে।

বড় ভাই খঞ্জর বের করে প্রস্তুত হয়ে রইল। দেখতে পেলো, দূর থেকে একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। মেয়েটি বললো, 'ওই যে সে এসে গেছে। কিন্তু আমি চাই না কোন খুনখারাবী হোক। ও যদি ভয় পেয়ে ফিরে যায় এবং আর আমাকে বিরক্ত না করার ওয়াদা করে তবে এবারের মত তাকে মাফ করে দিতে চাই। তুমি বসো, আমি ওকে এ প্রস্তাব দিয়ে দেখি ও কি করে।'

বড় ভাইকে রেখে ছোট ভাইয়ের কাছে এগিয়ে গেল শায়লা। বললো, 'ওই হারামী তো আগেই এসে হাজির। কিন্তু ওর হাতে খঞ্জর আছে। তুমি বরং ফিরে যাও। শেষে আবার কি না কি ঘটে যায়!'

ছোট ভাইয়ের মাথায় খুন চড়ে গেল। সে এ কথার কোন জবাব না দিয়ে খঞ্জর বের করে অন্ধের মত ছুটলো অপর আগন্তুকের দিকে। বড় ভাই যখন দেখলো সেই ছায়ামূর্তি ধেয়ে আসছে তার দিকে, সেও তেড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে শক্তি পরীক্ষায় মেতে উঠলো দুই যুবক, কিন্তু ওরা কেউ জানতেও পারল না এই প্রতিদ্বন্দ্বী তারই সহোদর ভাই, একই রক্ত বইছে ওদের শরীরে, একই মায়ের দুধ পান করেছে দু'জনে। দু'ভাই পরস্পরকে ভালওবাসে প্রাণের অধিক।

প্রবল বিক্রমে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দু'জনের চোখেই বন্য আক্রোশ, প্রতিহিংসার প্রবল উত্তাপ। ফলে কেউ কাউকে চিনতে পারল না, কেউ কাউকে রেহাইও দিল না। একের পর এক একে অন্যকে প্রবলভাবে আঘাত করেই চললো। সারা শরীর রক্তাক্ত হয়ে উঠল দু'জনের। নিস্তেজ হয়ে এল উভয়ের শরীর। জড়াজড়ি করে উভয়েই মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। আবার উঠল। আবার পড়ল। মেয়েটি বার বার চিৎকার করে বলতে লাগল, 'লাগাও, খুন করে ফেলো, শেষ করে ফেলো।'

উভয়েই ভাবছিল শায়লা তাকেই উৎসাহ দিচ্ছে। এ কথা ভাবতেই নিস্তেজ শরীরে আবার একটু ছলকে উঠতো শক্তির বিদ্যুৎ। উভয়েই আরো উত্তেজিত হতো তার উৎসাহে।

আলী বিন সুফিয়ানের এক অশ্বারোহী ওই পথ দিয়ে গ্রাম থেকে শহরে ফিরে আসছিল, হঠাৎ তার নজরে পড়ে গেল ওরা। অশ্বারোহী দ্রুত ওদের নিকটবর্তী হলো। মেয়েটি ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে চট করে মুখ ফিরাতেই দেখতে পেল অশ্বারোহীকে। ভয় পেয়ে ওখান থেকে ছুটে পালালো সে। ঢুকে গেল বাগানের ভেতরে, আরো অন্ধকারের দিকে। কিন্তু অশ্বারোহী তাকে বেশি দূর যেতে দিল না, ধাওয়া করে ধরে ফেললো তাকে। মেয়েটিকে নিয়ে লড়াইয়ের ওখানে ফিরে এল অশ্বারোহী।

ততক্ষণে লড়াই শেষ। দু'জনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। অশ্বারোহী মেয়েটির হাত বেঁধে ঘোড়ার জিনের সাথে আটকে দিল। এরপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করল আহত যুবক দু'জনকে।

তখনো মারা যায়নি দু'জনের কেউ। তবে অবস্থা একেবারেই শেষ পর্যায়ে। কারোরই সংজ্ঞা আছে কি নেই বুঝা যায় না, নিঃশ্বাস বইছে খুবই আস্তে।

'কি হচ্ছিল এখানে? এ যুবকেরা কারা?' মেয়েটিকে প্রশ্ন করল অশ্বারোহী।

'আমি চিনি না।' ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল মেয়েটি।

'বাজে কথা রাখো। শহর থেকে দূরে এই নির্জন স্থানে অন্ধকার রাতে তুমি কি তবে হাওয়া খেতে এসেছো? বলো যুবকদের নিয়ে এখানে কি করছিলে তুমি? কেমন করে যুবকদের এ ম[illegible]ন্ন অবস্থা হলো?'

মেয়েটি এবার জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল, কিন্তু প্রহরী তাকে ছাড়লো না। বলল, 'আমার প্রশ্নের জবাব দাও। বলো, তুমি কে, আর এই যুবকদের পরিচয় কি?'

মেয়েটি এবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

ধমকে উঠল অশ্বারোহী, 'খবরদার! হাসবে না, যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।'

'একজন যুবতীর কাছে যুবকরা কি চায় বুঝ না! কে আগে তাই নিয়ে ঝগড়া করে এবার দু'জনেই মরেছে। হায় আমার কপাল!'

প্রহরী আবার নাড়ি পরীক্ষা করল আহত যুবকদের। মেয়েটির কথা এবার আক্ষরিক অর্থেই সত্য প্রমাণিত হলো, দেখলো দু'জনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে প্রায় একই সময়ে।

লাশ দু'টি ঘোড়ার পিঠে তুলে লাগাম হাতে নিয়ে

মেয়েটিকে বললো, 'চলো।'

মেয়েটি অশ্বারোহীর গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তাকে লোভ দেখালো। অনুনয় করে বললো, 'যারা আমাকে ভোগ করার জন্য এখানে এনেছিল তারা নেই, আপনি আমার সাথে যা খুশি ব্যবহার করুন, কিন্তু দোহাই খোদার, আমাকে গ্রেফতার করবেন না।'

কিন্তু অশ্বারোহী তার কোন কথাই শুনল না, তাকে নিয়ে গেল আলী বিন সুফিয়ানের কাছে।

লাশ দু'টিও আনা হলো। যখন আলোয় আনা হলো লাশ দু'টি, চমকে উঠলো সবাই, আরে! এরা তো দুজনেই হাকিম আল ইদরিসের ছেলে!

আল ইদরিসকে সংবাদ দেয়া হলো। তার মাত্র দুটিই সন্তান, দু'জনই একই সাথে মারা গেছে এ দৃশ্য দেখলে তার কি অবস্থা হবে এ কথা ভেবে পেরেশান হলেন আলী বিন সুফিয়ান।

মেয়েটি উল্টা-পাল্টা কথা বলতে লাগলো। কোন প্রশ্নেরই সে সন্তোষজনক জবাব দিল না। সে কার মেয়ে, কোথায় থাকে, এসব সাধারণ প্রশ্নের জবাবও এড়িয়ে গেল মেয়েটি।

আল ইদরিস এলেন। দুই সন্তানের লাশের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন তিনি। কিছুই বললেন না, কোন প্রশ্নও করলেন না। বাড়ি গিয়ে ওদের মাকে কি বলবেন সে কথাও জানতে চাইলেন না কারো কাছে।

সব ঘটনা খুলে বলা হলো তাকে। তিনি বললেন, 'সন্তান

হারানোর বেদনায় ব্যথিত নই আমি, আমার আফসোস তাদের অপমৃত্যুতে। একটি সামান্য মেয়েকে নিয়ে দু'ভাইয়ের মাঝে মালিন্য হয়েছে এবং সেই মনোমালিন্য প্রথমে ঝগড়ায় এবং পরে খুনখারাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে এমনটি আমি ভাবতে পারছি না। এর মধ্যে কোন ঘাপলা অবশ্যই আছে। দু'ভাইয়ের মধ্যে খুবই সুসম্পর্ক ছিল। আজও সকালে ওরা এক সাথে বসে নাস্তা করেছে, খোশগল্প করেছে, কারো আচরণেই কোন ক্ষোভ বা রাগের কোন আলামত ছিল না। অথচ কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ওদের মাঝে এমন কি ঘটল যে, ওরা একে অন্যকে খুন করে বসলো! আমার মনে হয় এ রহস্য এখনই উদঘাটন না করলে জাতিকে তার জন্য বিরাট মাশুল দিতে হবে।'

আলী বললেন, 'আমরা রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টা করছি। মেয়েটা উল্টা পাল্টা বলে যতই বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করুক, সত্য তাকে প্রকাশ করতেই হবে।'

'ভাল করে চেপে ধরুন। আমাদের জানতে হবে আমার এমন সুবোধ ছেলে দুটোর এ হাল কেমন করে হলো?'

আলী বিন সুফিয়ানের সামনে হাজির করা হলো মেয়েটাকে। আলী বললেন, 'সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ যে কারো মনের কথা বের করার ক্ষমতা রাখে। আমি সহজভাবে তোমার কাছ থেকে আসল ঘটনা শুনতে চাই। যদি নিজে থেকে বলো, ভালো, না হলে কারো পেট থেকে কথা বের করার জন্য যেসব কৌশল প্রয়োগ করা হয় তা একে একে শুরু হবে। আমি চাই না তুমি সেই পর্যন্ত যেতে আমাকে বাধ্য

করো। তুমি কি তোমার পরিচয় এবং সব ঘটনা খুলে বলবে?'

'সবই তো বলেছি।' মেয়েটি বড় ভাইয়ের লাশের দিকে ইশারা করে বললো, 'এই লোকটা প্রথমে আমাকে ডাকে। আমি তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে ওখানে যাই। এমন সময় ওই লোকটা আসে। সম্ভবত শহর থেকেই ও আমাদের ফলো করছিল। আমরা ওখানে গিয়ে বসতেই ও খঞ্জর বের করে প্রথম লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করে বসলো। প্রথম লোকটাও চট করে খঞ্জর বের করে উঠে দাঁড়াল। শুরু হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে লড়াই। আমি ভয়ে একদিকে সরে গেলাম। এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার এল। ওকে আসতে দেখেই আমি ছুটে বাগানের গভীরে ঢুকে গেলাম। কিন্তু একজন সৈনিকের সাথে আমি পারবো কি করে? লোকটি আমাকে ধরে ফেললো এবং এখানে নিয়ে এলো।'

'কি নাম তোমার? তোমার বাবার নাম ও ঠিকানা বলো।'

'আমি আমার ও বাবার নাম এ জন্য বলবো না, এতে আমার ও বাবার নামে কলংক ছড়িয়ে পড়বে।'

আলী বিন সুফিয়ানের স্মরণ হলো, আরসালান ও আল ইদরিসের মধ্যে যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল তখন একাধিকবার সে আল ইদরিসের যুবক সন্তানদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

আরসালান আগে থেকেই আলীর সন্দেহভাজনদের তালিকাভুক্ত ছিল। তিনি তার মহলের মধ্যে একাধিকবার সন্দেহভাজন বহিরাগতদের নিয়ে বৈঠক করেছেন বলেও

রিপোর্ট করেছে তার ইনফরমার।

তিনি আল ইদরিসকে ইশারা করে বললেন, 'এ মেয়ে তার পরিচয় বলতে চাচ্ছে না। আমিও মনে করি এই মেয়ে সত্য কথাই বলেছে। সে একজন নারী হয়ে একা দু'জন যুবককে হত্যা করতে পারে না। এমন দোষে তাকে কেউ অভিযুক্ত করলেও আমি তা মেনে নিতে পারি না।'

তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'যাও তুমি মুক্ত। ভবিষ্যতে আর যেন কারো সাথে রাতের অন্ধকারে নির্জনে ঘুরাফেরা করতে না দেখি। এমন করলে কখন নিজেই খুন হয়ে যাবে ঠিক নেই।'

মেয়েটি দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। আলী বিন সুফিয়ান দু'জন ইনফর্মারকে ডাকলেন। একজনকে বললেন, 'তুমি দ্রুত আরসালানের মহলের ফটকের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকো।' অন্যজনকে মেয়েটির পিছনে এমনভাবে অনুসরণ করতে বললেন, যেন মেয়েটি টের না পায়। আর সে যেখানেই যাক তার সংবাদ যেন সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে পৌঁছে দেয়।

লোক দু'জন বেরিয়ে গেল। মেয়েটি দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সন্তর্পনে তাকে অনুসরণ করলো আলীর গোয়েন্দা। আলী বিন সুফিয়ানের সন্দেহই সত্য প্রমাণিত হলো। মেয়েটি আরসালানের মহলে প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে এ খবর পৌঁছে দেয়া হলো আলীর কাছে। আল ইদরিস এ খবর শুনে আলী বিন সুফিয়ানকে বললেন, 'আরসালান আমাকে আমার দুই যুবক ছেলে সম্পর্কে প্রশ্ন

করেছিল। তখন আমি তার ইশারা বুঝতে পারিনি। এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এই ষড়যন্ত্র আরসালানের কাজ। কি ভয়ংকর আর কুটিল তার পরিকল্পনা। দুই ভাইকে সে কেমন নিখুঁতভাবে একে অন্যকে দিয়ে হত্যা করিয়েছে।'

আল ইদরিস প্রধান হাকিমকে এ সংবাদ জানালেন। আলী বিন সুফিয়ান সিদ্ধান্ত নিলেন, আরসালানের বাড়িতে অতর্কিত পুলিশের আক্রমণ চালিয়ে সবাইকে গৃহবন্দী করতে হবে। পুলিশ সুপার গিয়াস কামালকে সে কথা বললেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে ঘেরাও করে ফেলল আরসালানের মহল।

'এখন আমি আল ইদরিসকে বলবো, কেন আমি এত সাহসকিতার সাথে কথা বলছিলাম সেদিন।' আরসালান মেয়েটির মুখে সমস্ত কাহিনী শুনে বললো, 'আমি তাকে আরো বলবো, দেখ আমি কি করতে পারি?'

সে মেয়েটির হাতে তুলে দিল শরাবের গ্লাস। তারপর দু'জনই সফলতার অপার আনন্দে মেতে উঠলো উৎসবে।

তাদের সে আনন্দ উৎসব তখনো শেষ হয়নি, হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সেখানে প্রবেশ করলো এক লোক। এ ব্যক্তির নাম আল ইদরিস। তিনি আরসালান ও মেয়েটিকে নেশায় মত্ত বেহাল অবস্থায় দেখতে পেলেন।

আরসালান নেশা জড়ানো কণ্ঠে বললো, 'আরে বাবা! এ যে দেখছি আল ইদরিস। কি মনে করে এলে? ছেলেরা তোমাকে না বলেই মরে গেছে! এ্যা, তুমি বাবা আবার কেন এলে? আমি তো তোমাকে এখনি খুন করবো বলে ঠিক

করিনি।'

তারপর হঠাৎ যেন তার হুশ ফিরে এল। সে চিৎকার করে ডাকলো, 'দারোয়ান! দারোয়ান কোথায়? এই লোক আমার বিনা অনুমতিতে আমার জান্নাতে কেমন করে প্রবেশ করেছে?'

'তোমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া জন্য!' আল ইদরিস বললেন, 'আমি আমার সন্তান হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসিনি। আমি তোমাকে গাদ্দারদের কি পরিণতি হয় তাই দেখাতে এসেছি।'

ইতিমধ্যে শহরের প্রধান হাকিম, যিনি এখন ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করছেন, ভেতরে প্রবেশ করলেন। তার সাথে পুলিশ প্রধান গিয়াস কামাল ও গোয়েন্দা প্রধান আলী বিন সুফিয়ান। মেয়েটিকে গ্রেফতার করা হলো। আরসালানের সমস্ত চাকর-চাকরানী ও বাড়ির অন্যান্য লোকদেরকে মহলে নজরবন্দী করে সেখানে সেনা প্রহরা বসানো হলো। মহলের ভেতর পাওয়া গেল একটি গোপন কক্ষ। কামরাটি গভীর ও প্রশস্ত। সেখানে তীর, ধনুক ও বর্শার স্তূপ। তলোয়ার ও খঞ্জরের ছড়াছড়ি। খৃস্টানদের উদ্ভাবিত নতুন এক জাতের আগ্নেয়াস্ত্র। কয়েকটি সিন্দুক ভরা গাঁজা, হাশিস, হেরোইন ও বিষ। আরেকটি কামরায় পাওয়া গেল সোনার ইট ও আশরাফীর থলি।

আরসালান তার দুই স্ত্রী ও সন্তানদেরকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছিল। বাড়িতে পাওয়া গেল অনিন্দ্য সুন্দর তিনটি যুবতী মেয়েকে। এদের মধ্যে কে যে কার চেয়ে বেশি সুন্দরী

সে বিচারের ভার কাউকে দিলে সে সাত দিন পর্যন্ত গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে, কিন্তু মুখ খুলবে না। তিনটি মেয়েই খৃস্টান।

রাতের মধ্যেই মহলের চাকর-বাকরদের জবানবন্দী নেয়া হলো। দেখা গেল তাদের মধ্যে তিনজন খৃস্টানদের গোয়েন্দা।

'তুমি কি স্বেচ্ছায় বলবে তোমার ইচ্ছা ও পরিকল্পনা কি?' প্রধান হাকিম আরসালানকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ধন-দওলত, এই অস্ত্রশস্ত্রের স্তূপ তোমার মৃত্যুদণ্ডের জন্য যথেষ্ট।'

'তবে মৃত্যুর শাস্তিই দিয়ে দাও।' সে নেশার ঘোরে বললো, 'যদি মরতেই হয় তবে নীরব থেকেই মরি না কেন?'

'সেটা তোমার ইচ্ছা। মৃত্যু মানেই তুমি আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে যাচ্ছো। আল্লাহ বড় মেহেরবান। এমনও তো হতে পারে, আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে তোমার যেসব বন্ধুরা কাজ করছে তাদের নাম এবং পরিকল্পনার কথা যদি বলে যাও, তিনি তোমাকে মাফও করে দিতে পারেন।' প্রধান হাকিম বললেন, 'আমি দোয়া করবো, তোমার এই পূণ্য কাজের জন্য আল্লাহ যেন তোমাকে এতবড় পাপ থেকেও ক্ষমা করে দেন।'

'তোমরা তো আর আমাকে ক্ষমা করবে না?' আরসালান বললো।

'সুলতান আইয়ুবী এর চেয়েও বড় পাপীকে ক্ষমা করেছেন এমন দৃষ্টান্তের কথা তোমার জানা আছে।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'তোমার বাঁচার পথ বের হতে পারে যদি তুমি বলে দাও এখানে কি ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ চলছে এবং যারা করছে তাদের ধরার ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করো।'

আরসালান মদের প্রভাবে ঠিকমত দাঁড়াতে পারছিল না। সে এদিক-ওদিক টলছিল আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল সবাইকে। আল ইদরিসের কোমরে ক্ষুদে তলোয়ারের মত লম্বাটে খঞ্জর ঝুলছে।

আরসালান টলতে টলতে এক সময় তার কাছাকাছি হলো এবং অকস্মাৎ কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই দ্রুতবেগে সে খঞ্জর টেনে বের করে নিজের বুকে বসিয়ে দিল।

আলী বিন সুফিয়ান ঝাঁপিয়ে পড়ে খঞ্জরটি কেড়ে নিতে চেষ্টা করলেন কিন্তু হাতের বেকায়দা চাপে তা পেটের আরও গভীরে ঢুকে গেল। আরসালান রক্তাক্ত বুকে লুটিয়ে পড়ল তার মূল্যবান লাল গালিচার ওপর।

পুলিশ সুপার খঞ্জরটি টেনে বের করতে চাইলে আরসালান হাত ইশারায় তাকে নিষেধ করে বলল, 'আগে আমার কথা শোন, আমি মরে গেলে তখন ওটা বের করে নিও।

আমি আমার পাপের শাস্তি নিজেই নিলাম। আমি আর জীবিত অবস্থায় সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সামনে উপস্থিত হতে চাই না। কারণ তিনি আমাকে একজন পরম বিশ্বাসী ও একান্ত বন্ধু বলে মনে করতেন। আমি যা বলছি তার বাইরে আমি তোমাদের কোন প্রশ্নের জবাব দেবো না। মিশর এক ভয়াবহ সংকটে পড়ে গেছে। মিশরে যে সেনাবাহিনী আছে তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সৈন্যদের রসদপত্রের ঘাটতির ব্যবস্থা আমিই করেছি। সৈন্যদের খাবারের কোন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না এই প্রচারণা

ছড়াচ্ছে খৃস্টানরা। আমার দলে অনেক ভাল লোকও আছে। আমি কারো নাম বলবো না। ফেদাইন ও ফাতেমীয় দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে মিশরের ধ্বংসের পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছে। তোমরা বিদ্রোহকে ঠেকাতে পারবে না। নতুন সৈন্য নিয়ে এসো অবস্থা তোমাদের নিয়ন্ত্রণের ....' আর কোন কথা সে বলতে পারলো না, তার প্রাণবায়ু শেষ হয়ে গেল।

তার বাড়িতে যে তিনজন মেয়ে পাওয়া গেলো, তাদের সম্পর্কেও সে কিছু বলতে পারলো না। ফলে মেয়েদের জবানবন্দীই গ্রহণ করতে হলো সত্য বলে। তারা নিজেদের সম্পর্কে বললো, তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ধ্বংস করা ও পুরুষদের ফাঁসানোর কাজে ব্যবহার করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

আরসালানের বাড়িতে রাতে গোপন আসর বসতো। এ আসরে বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা ও সামরিক অফিসাররা আসতো। এরই ফাঁকে চলতো তাদের গোপন বৈঠক। আসরকে মাতিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করা হতো মেয়েদের।

যে মেয়েটি দুই ভাইকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উস্কিয়ে তাদের খুন করিয়েছে সে হত্যার পুরো ঘটনা বর্ণনা করলো। সে বললো, সে প্রথমে আল ইদরিসের বড় ছেলেকে তার ভালবাসার জালে ফাঁসিয়ে নেয়। আরসালান প্রথমে তার ছেলেদেরকে আল ইদরিসের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু পরে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে মেয়েটিকে বলে, 'তার দুই সন্তানকে হত্যা করার ব্যবস্থা করো।'

এক রাতে প্রায় আড়াইশ উট কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা অফিসের সামনে এনে হাজির করা হলো। এগুলোর ওপরে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন সামগ্রী বোঝাই। এই উটগুলো কয়েকটি কাফেলায় বিভক্ত ছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে এদের ধরে আনা হয়েছে। দেশের খাদ্যসামগ্রী ও জিনিসপত্র দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ করার জন্য সর্বত্র টহল বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছিল। এটাই এই টহলদার বাহিনীর প্রথম সফলতা।

এইসব কাফেলার সঙ্গে যেসব লোক পাওয়া গেল তারা শহরের কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ীর নাম বললো। এই ব্যসায়ীরা সবাই ছিল আড়তদার। তারা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সেগুলো মাটির তলে গোপন কক্ষে লুকিয়ে রাখতো। এরপর গভীর রাতে অচেনা বেপারীরা এসে ওদের কাছ থেকে সেসব মাল চড়া দামে কিনে নিতো।

লোকগুলো এমন কিছু ঠিকানাও দিল যেখানে এ সকল অপরিচিত ব্যবসায়ীরা গোপনে বাস করতো এবং খাদ্যশস্য ও জিনিসপত্র মজুত করে পরে সুযোগমত দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতো।

উটের আরোহীরা সীমান্তের কয়েকটি স্থানের কথা বললো, যেখান থেকে এইসব মালামাল সুদানে পাচার করা হয়। সেখানে সীমান্ত পারাপার করার জন্য বিশেষ বাহিনী সর্বদা উপস্থিত থাকে। এরা সীমান্তে নিয়োজিত বিভিন্ন কমাণ্ডারদের সাথে আঁতাত করে এবং তাদের মোটা রকমের ঘুষ দিয়ে কাফেলা পারাপারের ব্যবস্থা করে। এসব কাজ আরসালানের ছত্রছায়ায় এবং তারই পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পন্ন

হতো।

আল ইদরিসের সন্তানদের বিপথগামী করার ঘটনা সে সব শত শত ঘটনার একটি, যা সুলতান আইয়ুবীর অনুপস্থিতির সুযোগে মিশরে বন্যার মত ছড়িয়ে পড়েছিল।

আল ইদরিস এবং অন্যান্য সকল হাকিম মিশরের এ অরাজক অবস্থা, আরসালানের বিশ্বাসঘাতকতা ও আল ইদরিসের দুই যুবক সন্তানকে হত্যা করার প্রতিবাদে এক প্রতিবাদ সভা আহ্বান করলো। বক্তৃতায় আলী বিন সুফিয়ান, গিয়াস কামালসহ সকলেই বললো, মিশরের অবস্থা এখন চরম বিশৃংখল হয়ে পড়েছে। এর নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা, মিশরে যদি বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে কিংবা ফাতেমী ও ফেদাইনরা যদি প্রভাবশালী লোকদের হত্যা করতে শুরু করে তবে এর দায়দায়িত্ব আমাদের ঘাড়েই পড়বে। এ ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগেই সমস্ত পরিস্থিতি সুলতান আইয়ুবীকে অবগত করানো উচিত। সুলতানকে অনুরোধ করা দরকার, যেন তিনি কারো ওপর যুদ্ধের দায়িত্ব ন্যস্ত করে কায়রো চলে আসেন।

এ বক্তব্যের সূত্র ধরে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আলী বিন সুফিয়ান যুদ্ধ সেক্টরে সুলতান আইয়ুবীর কাছে যাবেন পরিস্থিতি তুলে ধরতে।

ক্রাক অবরোধের দুই মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। খৃস্টানদের পক্ষ থেকে আক্রমণ বা আত্মসমর্পনের কোন লক্ষণ

দেখা যাচ্ছে না। তারা দুর্গের মধ্যে বসে আত্মরক্ষামূলক লড়াই চালিয়ে যেতে লাগল। আইয়ুবী রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিলেও তাতে ওদের তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। আইয়ুবী ক্রাক অবরোধ করতে আসছে শুনেই দীর্ঘদিন লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মত প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও রসদের মজুত তারা গড়ে তুলেছিল দুর্গের ভেতর।

দুর্গের ভেতরে আইয়ুবীর যে কমাণ্ডো বাহিনী আগেই ঢুকে পড়েছিল তাদের একজন আইয়ুবীকে এ সংবাদ সরবরাহ করল।

একটা তীরের মাথায় চিঠি বেঁধে সে তীর ছুঁড়ে মারল মুসলিম বাহিনীর দিকে। সে চিঠিতে লেখা ছিল: ভেতরে এদের খাদ্য এবং রসদপত্রের কোন ঘাটতি নেই। খৃস্টানরা এখানকার মুসলমানদের ওপর কড়া নজর রাখছে। মুসলমানরা এখন জানে, দেয়ালেরও কান আছে। ফলে ভেতর থেকে কোন কিছু করা এখন সম্ভব নয়। সুযোগ পেলে ভেতরের মুসলমানরা তাদের রসদপত্র ধ্বংস করে দিতে পারত. কিন্তু এখনো এমন কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি।'

রাতের নির্জন প্রহরে তীরের সাথে চিঠি বেঁধে এভাবে মাঝেমধ্যেই সংবাদ পাঠাতো ভেতরের গোয়েন্দারা। সৈন্যদের প্রতি নির্দেশ ছিল, এমন কোন তীর এলে তা যেন সাথে সাথেই কমাণ্ডারের কাছে পৌঁছে দেয়।

খৃস্টানরা চাচ্ছিল, অবরোধ দীর্ঘতর হোক। এতে সুলতান আইয়ুবীর শক্তি ক্ষয় হবে। সুলতান আইয়ুবী তাদের এ চাল বুঝতে পারলেন। ফলে তিনি যুদ্ধের পদ্ধতিতে পরিবর্তন

আনলেন।

এর আগে বাইরে থেকে আক্রমণের যে পরিকল্পনা তাদের ছিল তাও তিনি যথাসময়ে জানতে পেরেছিলেন এবং কৌশলে সে আক্রমণ শুধু ব্যর্থ করেননি বরং যে বাহিনী এ অভিযানে অংশ নিয়েছিল তাদেরকে এক নাজুক জায়গায় আজো ঘেরাও করে রেখেছেন। ক্রুসেড বাহিনীর এই দলটি দীর্ঘ দেড় মাস ধরে ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। তারা ঘেরাও থেকে বের হওয়ার জন্য যতবার চেষ্টা করেছে ততবারই বিপুল ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে।

ঘেরাওয়ের মধ্যে আটকেপড়া সৈন্যরা খাদ্যাভাবে কাতর হয়ে পড়ল। এ অভাব দূর করার জন্য তারা তাদের কোন পশু মারা গেলে ফেলে না দিয়ে খেয়ে ফেলতো। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হলো না। হাজার হাজার ঘোড়া ও উটের জন্য চরণভূমি ছিল সংকীর্ণ। পানির জন্য সেখানে কোন নদী বা কোন ঝর্ণা ছিল না। তিন চারটি নালা ছিল পানি পাওয়ার একমাত্র সম্বল। তা এ কদিন ব্যবহারের ফলে শুকিয়ে গেল।

এসব দেখে আটকেপড়া সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ও নৈরাশ্যের মেঘ জমতে শুরু করল। এর সাথে দেখা দিল আরেক নতুন বিপদ। রাতের বেলা মুসলিম কমাণ্ডোরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে তাদের ব্যাপক ক্ষতি করতে শুরু করল। কয়েকদিনের মধ্যেই এ সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা অর্ধেক হয়ে গেল। খেতে না পেয়ে তাদের পশুগুলো দুর্বল হয়ে পড়ল। এ বাহিনীর প্রধান রিমাণ্ড প্রচণ্ড অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছিল। একই অশান্তি ও

অস্থিরতা নিয়ে অপেক্ষা করছিল বাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা। কখন মিত্ররা এসে সুলতান আইয়ুবীর বেস্টনী থেকে বের করে নেবে তাদের, এই আশায় তারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে কিন্তু এই অপেক্ষা তাদেরকে হতাশা ছাড়া আর কিছুই দেয় না।

সুলতান আইয়ুবী ইচ্ছা করলে চারদিক থেকে আক্রমণ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন। কিন্তু আইয়ুবী তা করলেন না। ফাঁদে পড়া ইঁদুর মারার ব্যাপারে তার কোন তাড়াহুড়া নেই, তাঁর চিন্তা দুর্গ জয়ের পথে যারা অবিরাম প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে তাদের নিয়ে। এতে অবশ্য তাঁরও ক্ষতি হচ্ছিল, নিজের বাহিনীর সৈন্যদের ব্যস্ত রাখতে হচ্ছিল তাদের পাহারায়।

তিনি রিজার্ভ সৈন্যদের নিয়ে চিন্তা করলেন। দুর্গটি ভাঙার কাজে কি তাদের ব্যবহার করবেন? তিনি অবরোধ আর বেশিদিন দীর্ঘ করতে চান না। সে সময় যুদ্ধে বছরের পর বছর অবরোধ দীর্ঘ করার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু এ কৌশল তার পছন্দ ছিল না।

সুলতান আইয়ুবী কোন রাজ্য লোলুপ সেনাপতি ছিলেন না। তিনি কখনো কোন দেশের রাজধানী অবরোধ করে শহর কর্তৃপক্ষকে এ কথা বলেননি যে, এত পরিমাণ সোনা, হীরা, জহরত, এত হাজার ঘোড়া ও এতগুলো নারী এনে দাও, আমি অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে যাবো।

সুলতান আইয়ুবী ছিলেন এক মর্দে মুজাহিদ। ইসলামকে বিজয়ী দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন

তিনি। আরবের মাটি থেকে ইসলাম বিরোধী সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নির্মূল করার জন্য ঝলসে উঠতো তার তলোয়ার। তিনি যা বিশ্বাস করতেন জনগণের সামনে তা অত্যন্ত খোলামেলা ও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতেন। তিনি যা করতে চাইতেন তাই তিনি বলতেন, আর যা তিনি বলতেন তাই করতেন। সব সময় কথা ও কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখাই ছিল তার নীতি। এ ব্যাপারে তার কোন দ্বিধা সংকোচ ছিল না বলেই জনগণও তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখতো, তাঁকে পছন্দ করতো এবং ভালবাসতো।

তিনি বলতেন, 'এই আরবভূমিতে মহানবী (সা.) ইসলামের যে আলো জ্বেলেছিলেন সে আলো কেবল আরবেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বিশ্বের দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ সেই আরবের পবিত্র ভূমিতে বিকৃত হয়ে পড়েছে ইসলাম। ইহুদী ও খৃস্টানরা ইসলামের আলো নিভিয়ে দেয়ার জন্য একের পর ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। অত্যাচার চালাচ্ছে মুসলমানদের ওপর। এ অবস্থা কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না। রাসূল যেমন এক হাতে কোরআন নিয়েছিলেন সত্যের আলো ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং অন্য হাতে অন্যায় ও অসত্যকে নির্মূল করার জন্য তুলে নিয়েছিলেন অস্ত্র, সেই পথই মুসলমানের চলার পথ। যারা রাসূলের এ সুন্নাতকে অস্বীকার করে অন্য কোন তরীকা গ্রহণ করবে, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করা কোন মুসলমানের জন্য জায়েজ হতে পারে না।'

তিনি সময়ের গুরুত্ব দিতেন সবচে বেশি। বলতেন, 'মানুষের জীবন বড়ই সংক্ষিপ্ত। কোন মহান কাজ আঞ্জাম

দেয়ার জন্য নির্ধারিত হায়াতের বেশি সময় কেউ পাবে না। তাই আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ আমি অল্প সময়েই শেষ করতে চাই। প্রতিটি মুহূর্তকে আমি চাই প্রজ্ঞার সাথে এ কাজে ব্যয় করতে।'

তিনি বলতেন, 'আমার এ সংগ্রাম কেবল ইহুদী ও খৃস্টানদের বিরুদ্ধেই নয়, সেইসব মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধেও, যারা নিজেদের ক্ষমতা, অর্থ এবং প্রতিপত্তির লোভে এ মাটি বিধর্মীদের কাছে বিক্রি করতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে আমি অনড় এবং আপোষহীন। আর কেবলমাত্র আপোষহীনদেরই আমি আমার সঙ্গী হওয়ার আহবান জানাই।'

তিনি আরো বলতেন, 'আমার এ মনোভাবের ফলে খৃস্টানরা আমাকে মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা এটাকে গালি হিসাবে ব্যবহার করতে চায়। এক শ্রেণীর মুসলমানও চায় আমি আপোষকামী হয়ে যাই। কিন্তু আমার পক্ষে তা কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি বরং মৌলবাদী হতে পারায় গর্ববোধ করি।

কারণ, মৌলবাদী হওয়া মানে মূলের অনুগামী হওয়া, মূলের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। মূল কেটে ফেললে বৃক্ষ বাঁচে না, মৌলবাদী না হলে মানবতা বাঁচে না।

এ পৃথিবীর মূলে আছেন আল্লাহ। এ মূলের সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি না। আমি আল্লাহকে আল্লাহ, রাসূল (সা.)কে নেতা এবং ইসলামকে আমার জীবন বিধান মানি বলেই ওরা আমাকে মৌলবাদী বলছে। তার মানে, ইসলামই যে মানুষের জন্য মৌলিক জীবন বিধান তার সার্টিফিকেট তো

ওরাই দিচ্ছে। ওরাই তো স্বীকার করছে, পৃথিবীতে যত মতবাদ আছে তার মধ্যে একমাত্র ইসলামই মৌলিক। আমি মৌলবাদী, কারণ আমি এ মৌলিক সত্যের ধারক, বাহক। আর ওরা যার পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছে তা অ-মৌলিক অর্থাৎ ভেজালে পরিপূর্ণ। এ ভাবেই আল্লাহ দুশমনদের মুখ দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।'

তিনি আরো বলেন, 'কোন ছেলে কি তার মাকে অস্বীকার করতে পারে? এ পৃথিবীর আলো বাতাসে আমি যে আসতে পেরেছি তার মূলে আছে আমার মা। মৌলবাদকে অস্বীকার করা মানে এই মা-কে অস্বীকার করা। আর মায়ের স্নেহ মমতায় সিক্ত হওয়ার মানে মৌলবাদী হওয়া।

আল্লাহর বান্দা মৌলবাদী না হলে হয় বেঈমান, সন্তান তার জন্মের মূল না জানলে হয় জারজ সন্তান, দেশের নাগরিক মৌলবাদী না হলে হয় দেশদ্রোহী। আমি এর কোনটাই হতে চাই না। আমি আমার মাটি ও দেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে হতে চাই দেশপ্রেমিক, মায়ের স্নেহ মমতাকে ধারণ করে হতে চাই মানবতাবাদী, আল্লাহর গোলামী কবুল করে হতে চাই ঈমানদার।

মৌলবাদী হওয়া মানে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত থাকা। মানবতার সাথে সম্পৃক্ত থাকা। ইসলামের যে মৌলিক বিধান আছে তাকে যে গ্রহণ করে তাকেই ওরা মৌলবাদী বলছে। আমি আংশিক ইসলামের অনুসারী হতে চাই না। অ-মৌলিক বা দু'নম্বর কোন কিছুও গ্রহণ করতে চাই না। ফলে, যে যাই বলুক, আমি

তো আসলেই মৌলবাদী।

মানুষের মন থেকে মৌলবাদী হওয়ার চেতনা লোপ পাওয়ার ফলেই আজ বিশ্বব্যাপী পশুত্ব ও বর্বরতার বিস্তার ঘটেছে। মানুষের মন থেকে মনুষত্ব লোপ পেয়েছে। মানবিকতা লোপ পেয়েছে। কারণ, মৌলবাদকে অস্বীকার করলে মানবিকতাকে অস্বীকার করা হয়, মানবতাকে অস্বীকার করা হয়। কোন মুসলমান, যে নিজেকে আল্লাহর বান্দা বলে দাবী করে, সে কি করে মৌলবাদী হতে অস্বীকার করবে?

মুসলমান তো বিশ্বাস করে, এই পৃথিবী আল্লাহর এক বিশাল পরিবার। আমরা আল্লাহর খলিফা, মানে তাঁর প্রতিনিধি। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই পৃথিবীর দেখভাল করা। এই অনুভূতির কারণেই আমরা কেবল নিজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করি না, চিন্তা করি না কেবল আপনজনদের কথা। বরং আমরা কল্যাণ চাই বিশ্বের প্রতিটি মানুষের। কল্যাণ চাই সমগ্র সৃষ্টিকুলের। কারণ, এ সবই আল্লাহর এবং আল্লাহর এ সৃষ্টিকুলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের।

আল্লাহই আমাদের জানিয়েছেন, এ পৃথিবীতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এর সবকিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে কেবলমাত্র মানুষের জন্য। তিনি আরো জানিয়েছেন, আর এই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র তাঁর এবাদত করার জন্য।

আল্লাহর এবাদত মানে কেবল নামাজ, রোজা নয়, আল্লাহর এবাদত মানে আল্লাহর খলিফার দায়িত্ব পালন করা, তার এ সৃষ্টির সেবা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা। যেখানেই এর

ব্যতিক্রম ঘটে সেখানেই বিপর্যয় দেখা দেয়, সেখানেই অশান্তির সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি জগতের শান্তির স্বার্থেই আল্লাহর বিধানকে আমাদের পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। তাহলেই আর কোথাও অশান্তি থাকবে না, অনৈক্য থাকবে না, অসাম্য থাকবে না।

আল্লাহর মনোনীত এই একমাত্র দ্বীন ইসলাম ছাড়া আর যত মতবাদ সবই অ-মৌলিক, বিভ্রান্ত বা খণ্ডিত মতবাদ। ইসলামের সৌন্দর্য ধার করে পরগাছার মত টিকে থাকে তারা। তা যারা চায় না তারাই মৌলবাদী এবং আমি এ মৌলবাদী হয়েই চিরদিন বেঁচে থাকতে চাই।

যাদের মনে এ চেতনা ও বিশ্বাস নেই মানবতার কল্যাণের কোন চিন্তা করার দায়ও নেই তাদের। তাদের পক্ষে আত্মসুখে বিভোর হওয়াই স্বাভাবিক। 'খাও, দাও ফুর্তি করো, দুনিয়াটা মস্ত বড়ো' বলে পৃথিবীর যতটুকু পারে নিজের ভাগে নেয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে তারা। অন্যের জন্য ভাববার কি দায় ঠেকেছে তাদের! তাই, যেখানে ইসলাম নেই, সেখানে মানবতা নেই; যেখানে মানবতা নেই, সেখানে মৌলবাদ নেই। মৌলবাদ থাকলে ইসলাম থাকবে, ইসলাম থাকলে মানবতা থাকবে। মৌলবাদ, ইসলাম, মানবতা বৃহত্তর অর্থে এক ও অভিন্ন চেতনার নাম।

এক রাতে তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন। কি করে দুর্গে প্রবেশ করা যায় ভাবছিলেন তিনি। অদ্ভুতসব চিন্তা এসে মাথায় ভর করছিল। একবার ভাবলেন, মাটির নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খনন করে

দুর্গে প্রবেশ করলে কেমন হয়! আবার ভাবলেন, যদি অবরোধ উঠিয়ে সরে পড়ি এবং পরে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে অতর্কিতে হামলা করি! তিনি যখন এমনি সব ভাবনার রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তাবুতে প্রবেশ করলেন আলী বিন সুফিয়ান। তাকে দেখে সুলতান আইয়ুবী খুশি না হয়ে আরও ঘাবড়ে গেলেন। কারণ আগেই খবর পেয়েছিলেন, মিশরের অবস্থা আশংকাজনক।

সুলতান আইয়ুবী মুখে বিষণ্ন ভাব নিয়ে আলী বিন সুফিয়ানের সাথে কোলাকুলি করলেন এবং বললেন, 'তুমি আমার কাছে নিশ্চয়ই কোন সুসংবাদ বহন করে আননি?'

'সবটাই অমঙ্গলের নয়।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'কিন্তু সুসংবাদও কিছু নেই।'

তিনি সুলতান আইয়ুবীর কাছে মিশরের অবস্থা বলা শুরু করলেন। কোন কথাই গোপন করলেন না।

আলী বিন সুফিয়ানের কাছে আরসালানের বিশ্বাসঘাতকতার কথা ও আল ইদরিসের দুই যুবক ছেলের মৃত্যুর করুণ কাহিনী শুনে সুলতানের চোখে অশ্রু নেমে এলো। যদি আরসালান মরে না যেতো তবে তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা সুলতান আইয়ুবী কখনও বিশ্বাস করতেন না। আলীর কথা শুনে তার মনে পড়ল, আগেও তার দুই বন্ধু এমনিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

'যদি আরসালান আরও কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতো তবে সে আরও গোপন রহস্য প্রকাশ করতে পারতো।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'তার শেষ বাক্য, যা সে পূর্ণ করে যেতে

পারেনি তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, মিশরে বিদ্রোহ আসন্ন প্রায়। মিশরে আমাদের যে সৈন্য আছে তাদেরকে মানসিক ও চারিত্রিক দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলা হয়েছে। আমার গোয়েন্দা বিভাগ বলেছে, কমাণ্ডাররা পর্যন্ত ভুল ধারনা ও অশান্তির শিকার হয়েছে। সেনাবাহিনীর রেশন কমিয়ে দিয়ে তাদেরকে আরো অস্থির করে তোলা হয়েছে। যে সমস্ত খাদ্যশস্য সৈন্যদের জন্য পাঠানো হচ্ছে, তা পাচার করে অর্থ আত্মসাত করছে এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মচারী। এইভাবে শত্রুরা ষড়যন্ত্র পুর্ণ করে আনতে চাইছে।'

'শত্রুদের ষড়যন্ত্র সেই দেশেই সফল হয়, যে দেশের প্রশাসনযন্ত্রের কিছু লোক শত্রুদের সাথে গোপন যোগসাজশ রাখে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'যদি আমার এক ভাই শত্রুদের সহকর্মী হয়ে যায় তবে আমরা শত্রুদের কিভাবে মোকাবেলা করতে পারি? আমি যেভাবে আল্লাহ-ভক্ত সেনাবাহিনী নিয়ে খৃস্টানদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নাকানী চুবানী খাওয়াচ্ছি, যদি আমার সরকারী অফিসাররাও তাদের মত খাঁটি ঈমানদার হতো তবে আজ মুসলমানদের প্রথম কাবা মুসলমানদেরই হাতে থাকতো। আমাদের আজান আজ ইউরোপের গীর্জাতে ধ্বনিত হতো। কিন্তু এসব দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের কারণে আমি মিশরেই বন্দী হয়ে রইলাম। আমার আবেগ, আমার প্রেরণা, বিরাট বিরাট সংকল্প সবই এই শিকলে আটকা পড়ে গেল।'

তিনি কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। তারপর বললেন, 'আমাকে সবার আগে সেই গাদ্দারদের শেষ করতে হবে নতুবা এই

জাতিকে তারা উঁইপোকার মত খেয়ে শেষ করে ফেলবে।'

'আমি এই পরামর্শ নিয়েই এসেছি, যদি যুদ্ধ ক্ষেত্র আপনাকে পারমিশন দেয় তবে দয়া করে মিশর চলুন।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন।

'আলী! আমি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারি না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'কিন্তু আমার আফসোস! আমার হাত যখন খৃস্টানদের ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তখন তাদের মুক্ত করার জন্য এগিয়ে এসেছে আমারই জাতির ভাইয়েরা। আলী, যদি আমি ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্বকারী মুসলমানদেরকে এখনি শেষ না করি তবে এই উঁইপোকা আর কখনও শেষ হবে না। আমাদের ইতিহাসকে এই গাদ্দার দল চিরদিনের জন্য লজ্জিত করতে থাকবে। জাতির মধ্যে সব কালেই এই গাদ্দার দল সক্রিয় ও বর্তমান থাকবে, যারা আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলুল্লাহর (সা.) শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করে ইসলামের মূল কেটে শেষ করবে।'

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সুদানের যুদ্ধ ক্ষেত্রের খবর কি? আমি তকিউদ্দিনকে সংবাদ পাঠিয়েছি যুদ্ধ গুটিয়ে আনতে।'

'মিশরে কেউ জানে না, আপনি এমন আদেশ দান করেছেন।'

গভীর রাত পর্যন্ত আলীর সাথে আলাপ করলেন তিনি। মাঝ রাতের একটু পর আলীকে বিদায় দিলেন সুলতান। কামরা থেকে আলী বেরিয়ে যেতেই সুলতান আইয়ুবী গার্ডকে ডাকলেন। বললেন, 'কাতিবকে জলদি ডেকে আনো।'

কাতিব কাগজ কলম সঙ্গে করে তাবুতে প্রবেশ করলো। সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'লেখো,

'মুহতারাম নূরুদ্দিন জঙ্গী ....'

তিনি যখন চিঠি শেষ করলেন তখন রাত প্রায় শেষ।

পরদিন ভোর। কাসেদকে ডাকলেন সুলতান আইয়ুবী। তাকে বললেন, 'প্রত্যেক স্টেশনে তোমার জন্য নতুন সজ্জিত ঘোড়া প্রস্তুত থাকবে। ক্লান্ত ঘোড়া রেখে নতুন ঘোড়া বদলাতে যে সময়টুকু লাগবে তার বেশি কোথাও থামবে না। কোন বিশ্রামের সুযোগ নেই। আহার করবে ঘোড়ার পিঠে বসে। কোথাও যেন ঘোড়ার গতি শ্লথ না হয়ে পড়ে। যদি গভীর রাতেও তুমি বাগদাদ গিয়ে পৌঁছো, সঙ্গে সঙ্গে নূরুদ্দিন জঙ্গীর সামনে গিয়ে হাজির হবে। তিনি ঘুমিয়ে থাকলে দারোয়ানকে বলবে জাগিয়ে দিতে। যদি সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী রাগ করেন, বলবে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বলেছেন, আমরা সবাই জেগে আছি।'

গত রাতের লেখা চিঠি নিয়ে কাসেদ ছুটল বাগদাদের দিকে। কোন জায়গায় না থেমে পরের রাতের শেষ প্রহরে গিয়ে সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর ঠিকানায় পৌছে দিল সে চিঠি।

কাসেদ যখন নূরুদ্দিন জঙ্গীর দরোজায় গিয়ে উপস্থিত হলো, রক্ষী বাহিনী তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'চিঠি খুব ভোরেই তার কাছে পৌছানো হবে।'

কাসেদ পথে কয়েকবার ঘোড়া বদলালেও এক চুমুক পানি পান করার জন্যও কোথাও থামেনি। পর পর দু'টি রাত

জাগা এবং ক্ষুধা-পিপাসায় তার অবস্থা এখন মরার মত। সে কিছু বলতে চাইল, কিন্তু শুকনো খরখরে গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বের হলো না। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিও তার লোপ পেল। সে ওখানেই বসে পড়ে ইশারায় বললো, 'এটা খুবই জরুরী চিঠি।'

সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীও সুলতান আইয়ুবীর মত কিছু বিশ্বস্ত ও বিচক্ষণ অফিসার এবং বডিগার্ড রাখতেন, যারা জরুরী অবস্থা বুঝতে পারে এবং গুরুত্ব অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারে। প্রয়োজন মনে করলে তাঁর ঘুম ও বিশ্রামের চিন্তা না করে তাঁকে যে কোন সময় ডেকে দেয়ার অনুমতি ছিল তাদের।

কাসেদের এমন করুণ অবস্থা দেখে একজন বডিগার্ড ভেতরে গিয়ে নুরুদ্দিন জঙ্গীর শয়ন কক্ষের দরজায় খটখট শব্দ করলো। নুরুদ্দিন জঙ্গী বাইরে এসে কাসেদকে দেখে চিঠিসহ তাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন। কাসেদ ভেতরে প্রবেশ করেই পড়ে গেল। সুলতান জঙ্গী তার চাকর-বাকরকে ডেকে কাসেদের সেবাশুশ্রুষার জন্য তাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চিঠি পড়া শুরু করলেন।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী লিখেছেন :

মুহতারাম নূরুদ্দিন জঙ্গী! আপনার ওপরে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমার চিঠি আপনাকে খুশি করতে পারবে না। কিন্তু খুশি ও সান্ত্বনার বিষয় শুধু এই যে, আমি এখনও আশা ছাড়িনি, আপনার সঙ্গে চুক্তির বিষয় পূর্ণ করছি। আপনি আমার কাছে শুভাগমন করলে আপনাকে বিস্তারিত

জানাব। আমি ক্রাক দুর্গ অবরোধ করে রেখেছি। এখনও বিজয় আসেনি, তবে এতটুকু সাফল্য লাভ করেছি যে, খৃষ্টানদের এক বিরাট সৈন্যদল সম্রাট রিমাণ্ডের নেতৃত্বে বাইরে থেকে আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল, আমি তাদেরকে নিরাপদ আবেষ্টনীর মধ্যে আটকে রেখেছি। এ পর্যন্ত তাদের অর্ধেক সৈন্য শেষ হয়ে গেছে। ওদের ক্ষুধার্ত সৈন্যরা এখন ঘোড়া ও উট খেয়ে জীবন ধারণ করছে। আমি সেনাপতি রিমাণ্ডকে জীবিত বন্দী করার চেষ্টায় আছি। কিন্তু ক্রাকের অবরোধ দীর্ঘ হতে চলেছে।

দুর্গের অভ্যন্তরে খৃষ্টানদের অবস্থা যথেষ্ট মজবুত। আমি সফলতার জন্য কিছু পদ্ধতি ও কৌশল চিন্তা করেছি। আমার আশা আছে, আমার নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদরা দুর্গের পতন ঘটাবেই। তারা যে জযবা নিয়ে লড়াই করছে তা দেখলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন।

কিন্তু আমার ভাই তকিউদ্দিন সুদানের রণাঙ্গণে ব্যর্থ হতে চলেছে। তার ভুল একটাই, সে মরুভূমিতে তার সৈন্যদের ছড়িয়ে দিয়ে এখন দিশহারা হয়ে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি তাকে রণাঙ্গণ থেকে সরে আসতে আদেশ দিয়েছি। মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল নয়। গাদ্দার ও বিশ্বাসঘাতকরা ঈমান বিক্রি করার প্রতিযোগিতা করছে। এর ফলে মিশরে সেনা বিদ্রোহের আশংকা দেখা দিয়েছে। সেনা বিদ্রোহ ঘটলে খৃষ্টানদের আক্রমণের পথ সুগম হবে।

আলী বিন সুফিয়ানকে আপনি ভালমত জানেন, সে নিজেই আমার কাছে এসেছে। আমি তার পরামর্শকে উপেক্ষা

করতে পারছি না। তার পরামর্শ, আমি মিশরে ফিরে যাই। এখন আমি কি মিশর চলে যাবো?

মুহতারাম! আমি এখন ক্রাক থেকে অবরোধ উঠাতে পারছি না। সালাহউদ্দিন পিছু হটতেও জানে এ কথা বলার সুযোগ আমি খৃস্টানদের দিতে চাই না। এখন শত্রুর ঘাড় গর্দান আমাদের মুঠোর মধ্যে। আসুন, শত্রুদের এই ঘাড় গর্দান আপনি নিজের মুঠোয় ধারণ করুন।

আপনি আপনার সৈন্যবাহিনী সঙ্গে আনবেন। আমি আমার সৈন্য মিশরে নিয়ে যাব। তা না হলে মিশর বিদ্রোহীদের করতলগত হয়ে যাবে। আশা করি আমার দ্বিতীয় চিঠির অপেক্ষায় থাকবেন না।

ইতি
আপনার বিশ্বস্ত
সালাহউদ্দিন আইয়ুবী।

সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী আর এক মুহূর্তও দেরী করলেন না। তিনি রাতের পোশাকেই বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাতেই সেনাবাহিনীর অফিসার ও উপদেষ্টাদের নিয়ে বসলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করলেন বৈঠক। সৈন্যদের আদেশ দিলেন প্রস্তুতি নিয়ে ব্যারাক ছাড়তে। বললেন, 'দুপুরের আগেই ক্রাকের দিকে যাত্রা করবো আমি।'

কথামত দুপুরের আগেই তাঁর বাহিনী ক্রাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল।

সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী সেই মর্দে মুজাহিদ, যার নাম

শুনেই কেঁপে উঠতো দুশমনের অন্তর। তিনি ছিলেন রণকুশলী বীর। বুকে ছিল ঈমানের প্রজ্জ্বলিত আলো।

বাহিনী নিয়ে রাস্তায় তিনি কমই বিশ্রাম নিলেন। সুলতান আইয়ুবীর ধারনারও অনেক আগে তিনি ক্রাকের রণক্ষেত্রে এসে পৌঁছেন। যদি সংবাদ বাহক তাঁকে আগেই না জানাতেন যে, নূরুদ্দিন জঙ্গী আসছেন, তবে বহু দূর থেকে ধূলার মেঘ দেখে মনে করতেন, নতুন কোন ক্রুসেড বাহিনী আসছে।

সুলতান আইয়ুবী দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে এগিয়ে গিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন। নূরুদ্দিন জঙ্গী সালাহউদ্দিনকে দেখে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামলেন। ইসলামের মহান দুই নেতা যখন কোলাকুলি করছিলেন তখন আবেগে সুলতান আইয়ুবীর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

সুলতান আইয়ুবী নূরুদ্দিন জঙ্গীকে যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতি, গাদ্দারদের অপতৎপরতা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে শোনালেন। সুলতান জঙ্গী বললেন, 'সালাহউদ্দিন! ইসলামের জন্য এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে, বিশ্বাসঘাতকরা আমাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়ে গেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, জাতি এই গাদ্দারদের থেকে কোন দিন পরিত্রাণ পাবে না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এখনি এর প্রতিকার না হলে এমন এক সময় আসবে যখন এ গাদ্দাররাই সুকৌশলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে বসবে। তারা জাতিকে ধোকা দেয়ার জন্য শত্রুদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, তাদের মোকাবেলা করার কঠিন সংকল্প ঘোষণা করবে, এমনকি শত্রুদের পদদলিত করার হুংকারও দিতে থাকবে, কিন্তু জাতি

গেলেন ক্রাকের অবরোধ স্থলে। সুলতান আইয়ুবীর কাছ থেকে বুঝে নিলেন দায়িত্ব। আইয়ুবীর বাহিনীর স্থলে মোতায়েন করলেন নিজের বাহিনী।

আইয়ুবীর বাহিনী দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে পিছু সরে এসে একত্রিত হলো। তাদেরকে দ্রুত কায়রো যাওয়ার নির্দেশ দিলেন আইয়ুবী।

এদিকে এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। রিমাণ্ডের যে সৈন্য দলকে ঘেরাও করে রেখেছিল আইয়ুবীর বাহিনী সেখান থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার এবং জঙ্গীর বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে রিমাণ্ড মুসলিম বাহিনীর দুর্বল দিকে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বেস্টনী কেটে বেরিয়ে গেল এবং দ্রুত ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। অবশিষ্ট সৈন্যরা তখনো ঘেরাওয়ের মধ্যে, কিন্তু যখন তারা জানতে পারলো, সেনাপতি রিমাণ্ড পালিয়ে গেছে, তখন তারা ভীতবিহবল হয়ে এলোমেলো পালাতে শুরু করলো। তারা জীবন বাঁচানোর আশায় প্রাণপণ লড়াই শুরু করে দিল। এ লড়াইয়ে অনেকে মারা পড়লো, কেউ কেউ বন্দী হলো। পরিস্থিতি যখন মুসলিম বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে এলো ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, রিমাণ্ড পালিয়ে গেছে।

নূরুদ্দিন জঙ্গী এ ক্ষতি মেনে নিয়ে অবরোধ আবার দৃঢ় করলেন। সৈন্যদের সংহত করে দুর্গ অবরোধ ও বাইরের বাহিনীর বেস্টনী, সর্বত্র মুসলিম বাহিনীর অবস্থান মজবুত করলেন।

সুলতান আইয়ুবী কায়রোর দিকে যাত্রা করেছেন, কিন্তু

জানতেও পারবে না, এই শাসকগোষ্ঠী প্রকৃতপক্ষে জাতির ও দ্বীনের দুশমনদের সাথে তলে তলে কি গভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। শত্রুরা এই কপট মুসলমানদেরকে কখনো ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে, কখনো তলোয়ারও বানাবে এবং এই তলোয়ার দিয়েই জাতির ঘাড় ও শিরা কাটবে।

না, আমি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্য এ কথা বলছি না সালাহউদ্দিন! ভয় পাওয়া মুমিনের কাজ নয়। আমি কেবল বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করছি। কাফেরের চাইতে ঘরের শত্রু এইসব বিভীষণরা মিল্লাতে ইসলামিয়ার জন্য বেশি ক্ষতিকর। কারণ সামনাসামনি যারা লড়তে আসে জাতি তাদের চিনে এবং তাদের হাত থেকে নিজের দেশ ও ঈমান বাঁচানোর জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও পিছপা হয় না কেউ। কিন্তু বর্ণচোরা মুসলমানদের জাতি চিনতে পারে না, আর চিনলেও তাদের বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য নৈতিকভাবে সাহসী হয় না।

না সালাহউদ্দিন, এ অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। আমরা এ অবস্থার অবসান ঘটাবো। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। তুমি জলদি মিশরে চলে যাও। তকিউদ্দিনকে সহযোগিতা দিয়ে সুদান থেকে বের করে আনো। ডানে-বামে আক্রমণ করে শত্রু সেনাদের ব্যতিব্যস্ত রাখো যাতে তকিউদ্দিনের বাহিনী কোথাও ঘেরাও হয়ে না পড়ে। মিশরে যেসব সৈন্য রয়েছে তাদেরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি তাদের মাথা থেকে বিদ্রোহের পোঁকা বের করে দেবো।'

সন্ধ্যার পর নূরুদ্দিন জঙ্গী তাঁর সেনাবাহিনীকে নিয়ে

ক্রাকের কথা ভুলতে পারছেন না তিনি। বার বার পিছন ফিরে দেখছেন, সে চোখে রাজ্যের নৈরাশ্য। নূরুদ্দিন জঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় তিনি বললেন, 'ইতিহাস একথা তো আবার বলবে না যে, আইয়ুবী যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছু হটে গেছে? আমি অবরোধ তো উঠিয়ে নেইনি?'

'না! সালাহউদ্দিন, তুমি উঠাওনি।' নূরুদ্দিন জঙ্গী তাঁকে বললেন, 'তুমি কখনও পরাজয় বরণ করোনি, তুমি বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে গেছো। যুদ্ধ শুধু আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় না।'

'হে আমার ফিলিস্তিন! আমি আবার আসবো।' সুলতান আইয়ুবী ক্রাকের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি আবার আসবো।'

তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে নাড়া দিলেন এবং দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন মিশরের দিকে, আর পিছু ফিরে তাকালেন না।

নূরুদ্দিন জঙ্গী তাঁর পথের দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি যখন তার ঘোড়াসহ দূরে দিগন্তের অন্তরালে হারিয়ে গেলেন, তখন সুলতান নূরুদ্দিন তাঁর নায়েবে সালারকে বললেন, 'ইসলামের জন্য প্রত্যেক যুগেই সুলতান আইয়ুবীর মত মর্দে মুজাহিদ প্রয়োজন।'

এই ঘটনা ১১৭৩ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়কার। সে সময় প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রে খৃস্টানদের সামরিক শক্তি পাঁচ থেকে দশ গুণ বেশি হতো কিন্তু তারা অধিকাংশ সময় মুষ্টিমেয় মুসলমান মুজাহিদদের হাতে পরাজয় বরণ করতো। কখনো

তারা পরাজিত না হলেও জয়লাভ করতে পারতো না। তারা জানতো, কুরআনের আদেশ মুসলমানদের মধ্যে এমন এক যুদ্ধের জযবা সৃষ্টি করে যার শক্তিই অন্যরকম। তারা আল্লাহর নামে যুদ্ধ করে এবং এ পথে জীবন কুরবানী করাকে সাফল্য মনে করে।

খৃস্টানদের মধ্যে এমন কিছু জেনারেল ছিল যারা মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় এ জযবাকে প্রতিরোধ করার চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা শুরু করেছিল এবং সে অনুযায়ী কাজও শুরু করে দিয়েছিল। তারা এও জানত, একজন মুসলমান দশজন অমুসলিমের সাথে লড়াই করেও বিজয় লাভ করতে পারে। এটা কোন জ্বীন বা ভূতের কাজ নয় বরং তাদের মধ্যে আল্লাহর শক্তি ও বিশ্বাস কাজ করে বলেই তারা এ সাফল্য লাভ করে। এ সব মুজাহিদরা কোন কিছু পাওয়ার লোভ বা লালসায় যুদ্ধ করে না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রাণ বিলিয়ে দেয়।

সুতরাং সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর অনেক আগে থেকেই ইহুদী ও খৃস্টান পণ্ডিতরা মুসলমানদের সামরিক শক্তি ও জেহাদী জযবাকে দুর্বল ও নিঃশেষ করার জন্য যাবতীয় কৌশল ও প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। এ প্রচেষ্টার মূল ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তা নষ্ট করা এবং ঈমান ও আকিদায় ভেজাল মিশ্রিত করা।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী এ দু'জনের দুর্ভাগ্য ছিল এই, তাঁরা যখন খৃস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন, তার আগেই খৃস্টানরা ক্রুসেডের অভিযান শুরু

করে দিয়েছিল এবং তাদের এ অভিযান সফলতা লাভ করতে শুরু করেছিল। ইসলামের শত্রুরা এ অভিযান দু'দিক থেকে শুরু করে। একদিকে শাসক, আমীর, উজির এবং সেনা কমাণ্ডার, অন্য দিকে সাধারণ মানুষ। প্রথম শ্রেণীকে ওরা ঘায়েল করতো অর্থ, নারী ও শরাবে ডুবিয়ে, দ্বিতীয় শ্রেণীকে ঘায়েল করার জন্য ব্যবহার করতো জুয়া, নেশা, লোভ এবং ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও কুমন্ত্রণা।

সুলতান জঙ্গী ও সুলতান আইয়ুবী যেমন নিত্যনতুন রণকৌশল আবিষ্কার করতেন তেমনি খৃস্টানরাও তৎপর থাকতো মুসলমানদের বিপথগামী করার অভিনব কৌশল আবিষ্কারে।

এই আবিষ্কার প্রক্রিয়ায়ই আবিষ্কৃত হয়েছিল এক নতুন কৌশল, যাকে তারা অভিহিত করেছে সাংস্কৃতিক কৌশল বলে। এ সাংস্কৃতিক কৌশল এতটাই কার্যকরী প্রমাণিত হলো যে, এক সময় খৃস্টীয় শাসকবর্গ প্রকাশ্য ময়দানে যুদ্ধ করার পরিবর্তে এ পদ্ধতিকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে লাগল। তারা এই দর্শনের সমর্থক হয়ে গেল যে, যুদ্ধ এমন পদ্ধতিতে কর যেন মুসলমানদের যুদ্ধ করার জযবা ও আবেগ নষ্ট হয়ে যায়। তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে প্রবল আক্রমণ চালাও এবং তাদের মনে এমন সন্দেহ সৃষ্টি করে দাও, যাতে মুসলমানরা তাদের ধর্মভীরুদেরকে ঘৃণা করে এবং মুজাহিদদেরকে যুদ্ধবাজ বলে ভাবতে বাধ্য হয়।

এ চিন্তাধারার লোকদের মধ্যে প্রথমেই আসে ফিলিপ অগাস্টাসের নাম। সে এই চিন্তাধারায় খৃস্টান শাসকবর্গকে

উজ্জীবিত করে তোলে। ফলে এইসব খৃস্টান শাসকরা সৈন্যদেরকে বলতে থাকে, আমাদের যুদ্ধ সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও নূরুদ্দিন জঙ্গীর সাথে নয়, আমাদের যুদ্ধ ইসলামের সাথে।

এই যুদ্ধের সফলতা আমরা আমাদের জীবনে দেখে যেতে না পারলেও কোন না কোনদিন এর সফলতা আসবেই। সে জন্য প্রয়োজন মুসলমানদের নতুন প্রজন্মকে মানসিক দিক দিয়ে এমনভাবে গড়ে তোলা, যেন তারা যৌন উন্মাদনা ও বিলাসিতার জন্য পাগলপারা হয়ে যায়।

ফিলিপ অগাস্টাস তার মিশনকে সফল করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে সন্ধি করতেও আপত্তি করেনি। এটা ১১৬৯ খৃস্টাব্দের কথা। এ সময় সে নূরুদ্দিন জঙ্গীর হাতে পরাজিত হয়ে অধিকৃত অঞ্চল সন্ধির মারফতে ফেরত দিয়েছিল এবং নূরুদ্দিন জঙ্গীর দাবী অনুযায়ী জরিমানাও দিয়েছিল। সেই সাথে আর কোনদিন যুদ্ধ করবে না বলে অঙ্গীকার করে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরও করেছিল। জিজিয়া দিতেও রাজী হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের সময় সে প্রকাশ্যে বন্দী বিনিময় করল ঠিকই, কিন্তু সে এমন সব সৈন্যদেরকে বন্দী হিসাবে দেখাল যারা আর যুদ্ধ করার যোগ্য ছিল না। সুস্থ সবল সৈন্যদের সে হত্যা করে ফেলল। ফলে, তাদের যে সে কখনো বন্দী করেছিল তার আর কোন প্রমাণই রইল না।

কোন কোন খৃস্টান শাসক ও জেনারেল তাকে সন্দেহের চোখে দেখতো। কেউ কেউ তাকে দোষারোপ করতে লাগল

কেটে খাচ্ছে ওরা। এই চক্রান্তের ফলেই মিশরে এখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠছে, যে আগুন ঠাণ্ডা করতে সুলতান সালাহউদ্দিন আয়ুবীকে ক্রাক দুর্গের অবরোধ ছেড়ে ছুটে আসতে হলো মিশরে।

যে আইয়ুবী কখনো বিজয় ছাড়া ময়দান থেকে পা তোলে না, সেই আইয়ুবীকে শেষ পর্যন্ত সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর ওপর অবরোধের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সসৈন্য কায়রো ফিরে আসতে হলো। তিনি কোন দুর্বল হৃদয় মানুষ ছিলেন না, কিন্তু তবু তাঁর চোখে মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল নিরাশার ছায়া।

সেনাবাহিনী দেশে ফেরার আনন্দে খুশিই ছিল। তাদের ধারনা ছিল, বিশ্রামের জন্যই তাদেরকে কায়রো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞ সালাররা সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধের ধারা বুঝতে পারতেন। তারা সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীকে সৈন্যসহ ডেকে পাঠানোয় অবাক হলেও এটা বুঝেছিলেন, আইয়ুবীর মনে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা আছে। যিনি বিজয়ের সংকল্প নিয়ে দুর্গ অবরোধ করেছিলেন, বিনা কারণে তিনি সেখান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে পারেন না।

মিশরের অবস্থা যে খুব খারাপ এবং সুদানে তকিউদ্দিনের আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেছে, এ কথা সুলতানের দু'একজন ঘনিষ্ঠ সেনাপতি ছাড়া আর কেউ জানতো না। সুলতান আইয়ুবীর সাথে আলী বিন সুফিয়ানকে দেখে অভিজ্ঞ সালাররা কিছু না জানলেও এটুকু অন্তত বুঝেছিলেন, মিশরে কোন গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে।

যে, সে ভেতরে ভেতরে মুসলমানদের বন্ধু হয়ে গেছে।

তার এক বন্ধু একবার তার কাছে এ অভিযোগ করলে উত্তরে অগাস্টাস বললো, 'একজন মুসলমান শাসককে ফাঁসানোর জন্য আমার কুমারী মেয়েকে তার কাছে নিবেদন করতেও আমি আপত্তি করবো না। তোমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে যা আদায় করতে পারবে, আমার আনাড়ি এক কুমারী কন্যা তারচে বেশি আদায় করার ক্ষমতা রাখে। তোমরা মুসলমানদের সাথে সন্ধি ও আপোষ চুক্তি করতে ভয় পাও। এতে তোমরা অপমান বোধ কর। কিন্তু তোমরা এ কথা কেন চিন্তা করো না, মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ময়দানে মারার চেয়ে সন্ধির মাধ্যমে মারা সহজ। প্রয়োজন হলে তাদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করে শান্তি চুক্তি কর, আর বাড়ি ফিরে এসে আরামে বসে সে চুক্তির বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকো।

আমাকে দেখে শেখো। আমি কি ঠিক তাই করছি না? তোমরা জান, আমার দুই মেয়েকে দামেস্কের এক শেখের হেরেমে রেখেছি। সেই শেখের সাথে যুদ্ধ না করেই তোমরা কি তোমাদের সমস্ত অঞ্চল ফেরত পাওনি? সে কি বন্ধুত্বের মূল্য আদায় করেনি? সে আমাকে তার আপন জ্ঞাতি ও বন্ধু মনে করে। অথচ আমি যে তার জীবনের সবচে বড় শত্রু এ কথার প্রমাণ কি তোমরা পাওনি? আমি প্রতিটি খৃস্টানের কানে কানে বলতে চাই, যতো পারো মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি করো আর সুযোগ মত ধোকা দিয়ে নিঃশেষ করে দাও তাদের।'

এই হলো ক্রুসেডরত খৃস্টানদের মন-মানসিকতা। একটি সফল চক্রান্ত দ্বারা মুসলিম সাম্রাজ্যের মূল উইপোকার মত

সুলতান আইয়ুবী তার বাহিনী নিয়ে ক্রাক দুর্গ থেকে মার্চ করে কায়রোর দিকে এগিয়ে চলেছেন। রাস্তায় তিনি খুব কমই বিশ্রাম নিলেন এবং সেনাবাহিনীকেও বেশি বিশ্রামের অবকাশ না দিয়ে হাকিয়ে নিয়ে চললেন। এতেও অভিজ্ঞদের মনে সন্দেহ হলো, নিশ্চয়ই মারাত্মক কিছু ঘটেছে মিশরে।

সারাদিন পথ চলার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সন্ধ্যার পরও কিছুটা পথ চললেন তারা। এরপর সুলতান সৈন্যদের থামার নির্দেশ দিলেন। আইয়ুবীর জন্য তাবু টানানো হলো। তিনি এশার আযান পর্যন্ত বিশ্রাম নিলেন তাবুতে। নামাজের পর উপদেষ্টা ও অফিসারদের ডেকে পাঠালেন।

বৈঠকের শুরুতেই তিনি বললেন, 'আপনাদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই, কেন আমি অবরোধ উঠিয়ে সেন্যবাহিনী নিয়ে কায়রো যাচ্ছি। আসলে আমি অবরোধ উঠাইনি। আমরা কেউ ময়দান ছাড়িনি, বলতে পারেন সাময়িক পিছু হটেছি। কিন্তু কেন আমরা পিছু সরে এসেছি সে কথা শুনলে আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আপনাদের পিছু হটতে বাধ্য করেছে আপনাদেরই কিছু ভাই, আপনাদের কিছু বন্ধু!

তারা এখন ক্রুসেডের বন্ধু হয়ে গেছে। তারা বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করেছে যদি আলী বিন সুফিয়ান ও তাঁর নায়েব এবং পুলিশ সুপার গিয়াস কামাল সজাগ না থাকতেন তবে আপনারা আজ মিশর ফিরে যেতে পারতেন না। সেখানে এখন খৃস্টান ও সুদানীদের রাজত্ব কায়েম থাকতো। আরসালানের মত হাকিম খৃস্টানদের দালাল হয়ে গিয়েছিল।

সে আল ইদরিসের দুই যুবক ছেলেকে হত্যা করেছে। ধরা পড়ার পর নিজেও আত্মহত্যা করছে। যদি আরসালানের মত লোক গাদ্দার হতে পারে তবে আর কার ওপর ভরসা করা যেতে পারে?'

উপস্থিত সবার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। নীরবতা ছেয়ে গেল সকলের মাঝে। ক্ষোভ ও ক্রোধে শ্রোতাদের চোখে মুখে ফুটে উঠল অস্থিরতা ও অশান্তি। সুলতান আইয়ুবী চুপ করে সবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। মোমবাতির কম্পমান আলোতে সকলের চেহারা এমন দেখা যাচ্ছিল, যেন তারা একে অন্যের অপরিচিতি। তাদের চোখে কোন পলক ছিল না। সুলতান আইয়ুবীর কথার চেয়ে তার ভাষার গাম্ভীর্য সকলের মনে ভয় ধরিয়ে দিল. ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল সবাই।

তিনি বললেন, 'আমি গাদ্দারদের ক্ষমা চাইতে বলবো না। এ কথাও বলবো না, ইসলাম ও মুসলিম সাম্রাজ্যের অনুগত থাকার জন্য সকলেই কোরআন ছুঁয়ে শপথ করো। ঈমান বিক্রি করার লোকেরা কোরআন হাতে নিয়ে শপথ করেও বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে। আমি শুধু আপনাদের বলতে চাই, অমুসলমান কখনো মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। যারা আল্লাহ ও রাসূলের শত্রু তারা আমার আপনারও শত্রু। শত্রু যখন আমাদের সঙ্গে ভালবাসা ও বন্ধুত্বের ভাব দেখায় তখন তার মধ্যে শত্রুতা গোপন থাকে। অন্তরের গভীরে সে যে শত্রুতা লুকিয়ে রাখে সময় ও সুযোগ মত সে তা ব্যবহার করে। তারা ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, বন্ধুর ক্ষতি করতে ব্যবহার করে বন্ধুকে। এসব কুচক্রীরা ধর্মের

ক্ষতি করার জন্য ব্যবহার করে ধর্মের অনুসারীদের। ইসলামের ক্ষতি করার জন্য তারা বেছে নেয় মুসলমানদের। স্বার্থপর ও লোভীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ওরা। তারপর এইসব বিশ্বাসঘাতক মুসলমানদের দিয়ে ইসলামের সর্বনাশ করতে থাকে।

আমরা আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যুদ্ধ করছি না, ঈমানের দাবী পূরণের জন্য জিহাদের ডাকে সাড়া দিয়েছি। নিজস্ব শাসন ক্ষমতা কোন দেশের ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য নয়, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য এ জিহাদ। দুই ভিন্ন মতবাদ ও বিশ্বাসের যুদ্ধ এটা, যার একদিকে ইসলাম অন্য দিকে কুফর। এই যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে, যে পর্যন্ত না দুনিয়ার বুক থেকে কুফর মিটে যাবে এবং ইসলাম বিজয়ী হবে।'

উপস্থিত সালারদের চেহারা তখন রাগে টগবগ করে ফুটছিল। অত্যধিক রাগের কারণে কথা বলতে পারছিল না কেউ। শেষে একজন সেনাপতি কোন মতে নিজকে সংযত করে বললো, 'আমার বেয়াদবী ক্ষমা করবেন সালারে আজম! যদি মনে করেন আমরা বিশ্বাসঘাতক নই, তবে আমাদেরকে মিশরের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। কারা এই গাদ্দার আমরা জানতে চাই।'

'আরসালান সেনা বিভাগের কেউ নয়, সে প্রশাসনের হাকিম ছিল। আপনি প্রশাসন বিভাগেই গাদ্দার পাবেন, সেনা বিভাগে নয়।' বললেন আরেকজন উত্তেজিত সালার।

'ক্রাক দুর্গের অবরোধ আপনি উঠিয়ে নিয়েছেন, আমরা

উঠাইনি। সম্মানিত জঙ্গী সাহেবকে আপনিই ডেকে এনেছেন, আমরা নই। আমাদের পরীক্ষা যুদ্ধের ময়দানেই হতে পারে, ঘরে বসে নয়। আমরা শুধু জানতে চাই, এখন মিশরে কি হচ্ছে?'

সুলতান আলী বিন সুফিয়ানের দিকে তাকালেন। বললেন, 'আলী, এদের বলো, সেখানে কি হচ্ছে?'

আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'গাদ্দাররা শত্রুদের সাথে মিশে সুদানের যুদ্ধ সেক্টরে পাঠানো রসদপত্র লুট করে। হাট বাজার থেকে খাদ্যশস্য উধাও করে ফেলে। পল্লী এলাকায় অচেনা লোক এসে খাদ্যশস্য কিনে নিয়ে যায়। বাজারে গোশত পাওয়া যায় না। অথচ এ অবস্থায়ও প্রশাসনের লোকেরা খাদ্য ও রসদ সরবরাহের সময় কোন পাহারার ব্যবস্থা রাখে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আগেই শত্রুদেরকে এ সংবাদ জানিয়ে দেয়। ফলে শত্রুরা রাস্তায় কাফেলা থামিয়ে লুট করে নিয়ে যায় সব মালামাল।'

আলী আরো বললেন, 'শহর বাজারে নিষিদ্ধ কাজ বেড়ে গেছে। জুয়া খেলা এমন আনন্দদায়ক বিষয় হিসেবে চালু হয়ে গেছে যে, আমাদের যুবকরা সে দিকে ঝুঁকে পড়ছে। পল্লী অঞ্চল থেকে কোন যুবক সেনাবিভাগে ভর্তি হতে আসে না। এদিকে সৈন্যদের মাঝেও অশান্তি বেড়ে গেছে। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংহতি ধ্বংস করার পায়তারা চালাচ্ছে তারা। দেশে ছোট ছোট রাজ্যের শাসকরা স্বাধীন শাসক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তাদেরকে এ লোভ দেখিয়েছে খৃস্টানরা। এদের কাছে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ আসছে। কেন্দ্রীয় শাসন

ও খেলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে এইসব কুচক্রীরা।

সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে পল্লী অঞ্চল। পল্লীর সাধারণ জনসাধারণ এমনিতেই মুর্খ, অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সম্প্রতি তারা অদ্ভূত অদ্ভূত আকিদা বিশ্বাসে জড়িয়ে পড়ছে। ওখানে নতুন নতুন পীরের আবির্ভাব ঘটছে। তারাই এসব অদ্ভূত আকীদা বিশ্বাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। এর ফলে জনগণ অমুসলিমদের মত আচার আচরণ ও চাল চলনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। সবচেয়ে ভয়ের কারণ হচ্ছে, এর ফলে পল্লী এলাকা থেকে যে অগণিত যুবক সৈন্য দলে ভর্তি হতে আসতো তারা সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। অথচ সেনাবাহিনীতে এতদিন এই পল্লী অঞ্চলের যুবকরাই বেশি করে ভর্তি হতো। এখন নানা অমূলক ও অনৈসলামিক ধারণা-বিশ্বাস পল্লী অঞ্চল থেকে ভর্তি হওয়া সৈন্যদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে।'

'আপনি এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি?' একজন উত্তেজিত সালার প্রশ্ন করল।

'নিয়েছি।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'আমার গোয়েন্দা বিভাগ অপরাধীদের সনাক্ত করা ও ধর পাকড়ে ব্যস্ত আছে। আমার চর প্রত্যন্ত পল্লী এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু শত্রুদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড এত বেশি বেড়ে গেছে যে, দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতার করাও মুশকিল হয়ে পড়েছে। বেশি অসুবিধা হচ্ছে, মুসলমানরা শত্রুদের গোয়েন্দা এবং দুষ্কৃতকারীদের সহযোগী হওয়ায়। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন,

পল্লী অঞ্চলের কিছু কিছু মসজিদের ইমামও দুষ্কৃতকারীদের সহযোগী হয়ে পড়েছে।'

একজন অফিসার প্রশ্ন করল, 'প্রশাসন দুর্নীতিবাজ হয়ে পড়ায় এখন কি সেনাবাহিনীকে সেখানে নেয়া হচ্ছে প্রশাসনিক কাজ করানোর জন্য?'

'না, বেসামরিক কাজে আমি সামরিক লোক নিয়োগ করবো না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'সৈন্য বিভাগ যে উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে তারা সেই দায়িত্বই পালন করবে। এতে রাজ্যের জন্যও মঙ্গল, সৈন্যদের জন্যও মঙ্গল। একজন কোতোয়াল কখনও সেনাপতি হতে পারে না, তেমনি কোন সেনাপতিও কোতোয়ালের দায়িত্ব পালন করতে পারে না।'

তিনি আরো বললেন, 'আমাদের উচিৎ প্রশাসন কি কাজ করছে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। তারা দায়িত্ব পালনে কোন অবহেলা ও ত্রুটি করছে কিনা দেখা। বন্ধুগণ! আল্লাহ আমাদেরকে ইতিহাসের এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। এ পরীক্ষায় পাশ করতে হলে আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে।

মিশরের অবস্থা আপনারা শুনেছেন। সুদানের অভিযানও ব্যর্থ হয়েছে। তকিউদ্দিন তার পরিকল্পনার ভুলের জন্য মরুভূমিতে আটকে গেছে। তার সৈন্যদল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মরুভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে। পিছু হটারও কোন সুযোগ পাচ্ছে না তারা। আমি বলতে পারি না, মুহতারাম নূরুদ্দিন জঙ্গী ক্রাক জয় করতে পারবেন কি না। কিন্তু এটাও আমারই ব্যর্থতা বলবো।

তিনি হয়ত প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মোকাবেলা করে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকবেন এবং শত্রুদের পরাজিত করতে পারবেন। কিন্তু শত্রুরা যে অদৃশ্য সেক্টরে আমাকে আহবান করেছে সে সেক্টরে শত্রুদের পরাজিত করা আসলেই খুব কঠিন হবে। জঙ্গী অস্ত্র ধারণে পটু, মরুভূমির বুক চিরে চিতা বাঘের মত ছুটতে পারেন তিনি, কিন্তু আমি কোথায় ছুটে যাবো, কার ঘাড়ে অস্ত্র চালাবো?' থামলেন সুলতান।

একটু বিরতি নিয়ে সুলতান আইয়ুবী আবার বললেন, 'এখন যে সমস্ত সৈন্য মিশরে আছে, তারা যখন সুবাক রণক্ষেত্রে গিয়েছিল. তখন তাদের মধ্যে ঈমানী জযবা এমনিই ছিল. যেমন আজ আপনাদের মধ্যে আছে। কিন্তু কায়রোর নিরাপদ সেনা ছাউনিতে বসে আজ তারা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। এখন অবস্থা এমন যে, এই সৈন্যদের আর বিশ্বাস ও ভরসা করার উপায় নেই।'

'দ্বীনের প্রতি ভালবাসা নেই. জাতির প্রতি দরদ নেই এমন প্রতিটি সৈনিককে আমরা হত্যা করবো।' একজন অফিসার আবেগে কাঁপতে কাঁপতে বললো।

'আমরা সর্বপ্রথম সেইসব অফিসার ও গাদ্দারদের থেকে পবিত্র হবো যারা দুশমনের জালে পা দিয়ে নিজের ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে।' বললো অন্যজন।

'যদি আমার সন্তানও দুশমনের বন্ধু প্রমাণিত হয়, তবে আমি নিজ হাতে তার মাথা কেটে আপনার পদতলে সমর্পন করবো।' একজন বৃদ্ধ সালার বললো।

বৈঠকে উপস্থিত প্রতিটি চেহারায় প্রত্যয় ও সংকল্পের

দৃঢ়তা টগবগ করে ফুটছিল। সুলতান আইয়ুবী তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনাদের এসব আবেগময় ও উত্তেজিত কথাবার্তা সমর্থন করতে পারি না।'

উপস্থিত লোকগুলোর চোখে মুখে দেখা গেল প্রচণ্ড ক্রোধ ও ক্ষোভের চিহ্ন। এরা এমনসব লোক ছিল, সুলতান আইয়ুবীর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও যারা ভয় পেত। কিন্তু এখন তারা আগুন ঝরা চোখ নিয়ে সুলতানের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রতিটি চোখ যেন বলছে, একদিন যারা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতো, দ্বীনকে বিজয়ী করার স্বপ্ন দেখতো আমাদেরই মতো, সেই ঈমানদীপ্ত মোজাহিদদের অন্তরকে যারা কলুষিত করেছে তাদের কোন ক্ষমা নেই।

তরুণ অফিসারদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হলো সবচে ভয়াবহ। সৈন্যরা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে শুনে তাদের মাথায় রাগে আগুন ধরে গেল। একজন তো সুলতানকে বলেই ফেললো, 'আপনি আমাদেরকে সবসময় ধৈর্য সহকারে চিন্তা করার ও ধীরস্থিরভাবে কাজ করার উপদেশ দিয়ে এসেছেন। আমরা কখনো আপনার আদেশ অমান্য করিনি এবং উত্তেজিতও হইনি। কিন্তু আজ যা বললেন, তারপর ধৈর্য ধরার কোন শক্তি আমার নেই। আমাদেরকে আপনি এই হুকুম দিন, কায়রো পৌঁছার আগ পর্যন্ত আমরা রাস্তায় আর কোথাও থামবো না। আমরা আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম ত্যাগ করে লাগাতার পথ চলে কায়রো পৌঁছবো এবং দুষ্কৃতকারীদের শায়েস্তা করে তবেই ছাউনিতে ঢুকবো।'

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পক্ষে এই উত্তেজিত অফিসারদের

নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তিনি আরও কিছুক্ষণ তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে বৈঠক শেষ করলেন।

ভোরে সেনাবাহিনী আবার কায়রোর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। এ যাত্রা যথারীতি কমাণ্ডেই হচ্ছিল। সুলতান আইয়ুবীও আগের মতই অফিসারদের সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, আলী বিন সুফিয়ান তাঁর সঙ্গে নেই।

সন্ধ্যা পর্যন্ত সৈন্যদের দুইবার থামানো হলো। সন্ধ্যার পরও সৈন্যরা চলতেই থাকলো। রাতের প্রথম প্রহর শেষ হয়ে গেলে সুলতান আইয়ুবী বিশ্রামের জন্য সৈন্যদের থামতে বললেন। খেতে বসে সুলতান আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে আলী বিন সুফিয়ানকে তালাশ করলেন, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেলেন না।

খাওয়ার পর তিনি যখন তাবুতে ফিরে এলেন তখন আলী বিন সুফিয়ান এসে সেখানে হাজির হলেন।

'সারাদিন কোথায় ছিলে আলী?' সুলতান জিজ্ঞেস করলেন।

'গত রাতে আমার মনে একটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল।' আলী বিন সুফিয়ান উত্তরে বললেন, 'সেই সন্দেহ সঠিক কিনা জানার জন্য সারাদিন সৈন্যদের মাঝে ঘোরাফেরা করলাম।'

'কি সন্দেহ হয়েছিল?'

'আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আমি যখন মিশরের অবস্থা বর্ণনা করলাম তখন সেনাপতি, কমাণ্ডার ও সমস্ত অফিসাররা কেমন আগুন হয়ে গিয়েছিল।' আলী বিন সুফিয়ান বললেন,

'আমার সন্দেহ হচ্ছিল, এরা নিজেদের গ্রুপের সৈন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উত্তেজিত করে তুলবে। আমার সন্দেহই সত্য প্রমাণিত হলো। তারা সত্যি সত্যি তাদের দলের সাধারণ সৈন্যদেরকে মিশরের প্রশাসন ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। আপনি সৈনিকদের যতটা স্বাভাবিক দেখছেন, তারা ততটা স্বাভাবিক নেই। এখনকার এই নিস্তরঙ্গ পরিবেশ আসলে প্রচণ্ড ঝড়েরই পূর্বাভাস। প্রতিটি সৈনিকের ভেতর এখন প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আমি সৈন্যদের বলতে শুনেছি, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ ও আহত হচ্ছি আর আমাদের সাথীরা কায়রোতে আরামে বসে ইসলামের পতাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়? কায়রো গিয়ে প্রথমেই এই গাদ্দারদের শেষ করবো, তারপর রওনা দেবো সুদানে আটকে পড়া সৈন্যদের সাহায্যে। সম্মানিত সুলতান! যদি আমরা পথে আর কোথাও বিশ্রাম ও বিরতি না নিয়ে সোজা কায়রো গিয়ে পৌঁছি, তবে পৌঁছার সাথে সাথেই সেখানে গৃহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আমাদের সৈন্যরা ক্ষীপ্ত, উত্তেজিত। তারা প্রতিশোধের নেশায় পাগলপারা। আর মিশরে অবস্থানকারী সৈন্যরাও বিদ্রোহের বাহানা খুঁজছে। এ অবস্থায় আমাদের করণীয় সম্পর্কে একটু চিন্তা ভাবনা করা প্রয়োজন।'

'আমি এ বিষয়ে খুবই খুশি যে, আমাদের সৈন্যরা ঈমানী জযবায় এখনো অটুট আছে। তাদের এ আবেগকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'কিন্তু আমাদের শত্রুরাও এটাই চায়। তারা চায় আমাদের সেনাবাহিনী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ুক।

তিনি গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। আলী বললেন, 'সুলতান, আমাদের এ ফৌজ কায়রো পৌঁছার আগেই মিশরের ব্যারাকে অবস্থানরত সৈন্যদের অন্য রাস্তায় ক্রাকের সেক্টরে যাত্রা করিয়ে দিতে হবে। অবিলম্বে কাসেদ ও দায়িত্বশীল অফিসার পাঠিয়ে এর ব্যবস্থা করুন।'

সুলতান একটু চিন্তা করলেন। বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছো। তবে দূত পাঠিয়ে আদেশ দিলে হবে না। ভেতরের কথা বলা যাবে না তাদের। ফলে আমার সৈন্য কায়রো পৌঁছার আগেই তাদের বেরিয়ে পড়তে হবে, এমন কোন তাড়া ওদের থাকবে না। এর মধ্যে আমার বাহিনী ওখানে পৌঁছে গেলে পরিস্থিতি আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো না। তারচে বরং আমি নিজে সেখানে চলে যাই এবং ওদেরকে ক্রাক যাত্রার নির্দেশ দিয়ে সবকিছু নিজে তদারক করি। আমি নিজে গিয়ে আদেশ দিলে তারা মনে করবে তারা আমার কমাণ্ডে যাত্রা করেছে।'

সুলতান উঠে দাঁড়ালেন। ডাকলেন গার্ডকে। বললেন, 'আমার ঘোড়া তৈরী করো।' এরপর ডাকলেন নায়েবে সালারকে। বললেন, 'আলীকে নিয়ে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। সকালে বাহিনী নিয়ে তুমি কায়রো রওনা দেবে। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। ওখানে পৌঁছেই সৈন্যদের অভিযানে নেমে পড়তে হবে, তাই যতটা সম্ভব বিশ্রামের সুযোগ দেবে ওদের। পথে তোমাদের সাথে আর দেখা হবে না. কায়েরোয় তোমাদের জন্য আমি অপেক্ষা করবো।'

তখন গভীর রাত। আলীকে নিয়ে পথে নামলেন সুলতান

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। মাথার ওপর ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের ঘোলাটে জোসনা। দূর দিগন্তে আবছা দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট পাহাড়ের চূড়া। বালিয়াড়ি ভেঙে এগিয়ে চলেছে দুটো ঘোড়া, একটিতে সুলতান আইয়ুবী, অন্যটিতে আলী বিন সুফিয়ান।

সুলতানের দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। চেহারায় চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট। সুলতান ভাবছেন, ক্রাকে নূরুদ্দিন জঙ্গী কি সফল হতে পারবেন? তকিউদ্দিন এখন কেমন আছে, সে কি তার বাহিনীকে সংগঠিত করতে পেরেছে? নাকি এরই মধ্যে সুদানীরা তাদের ঘেরাও করে তাদের ওপর ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু করে দিয়েছে? মিশরের পরিস্থিতিই না জানি কি এখন। এরই মধ্যে বিদ্রোহ তো শুরু হয়ে যায়নি! আল ইদরিসের ছেলেদের মত কেউ তো আর খুন হয়নি! তিনি কি প্রশাসনে যে সব গাদ্দাররা ঘাপটি মেরে আছে তাদের সবাইকে সনাক্ত করতে পারবেন? পারবেন কি তাদের কবল থেকে মিশরের জনগণকে রক্ষা করতে? সীমান্ত এলাকায় যে নতুন ফেতনা শুরু হয়েছে কি দিয়ে তিনি তার মোকাবেলা করবেন? যে ক্ষীপ্ত সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছে তার পিছনে, কায়রো পৌঁছে তারা কি এমন কোন পদক্ষেপ নেবে যার মোকাবেলা করা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে? এরকম হাজারটা চিন্তা মাথায় নিয়ে পথ চলেছেন সুলতান। পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে আলী।

'আলী, বিপদ একটা আসলে সামাল দেয়া যায়। চতুর্দিক থেকে বিপদের এমন পাহাড় ভেঙে পড়লে কোনটা রেখে কোনটা সামাল দেবো?'

'এ নিয়ে খুব কি দুশ্চিন্তা করার দরকার আছে সুলতান! বিপদ যত ভয়ংকরই হোক, আল্লাহ নিশ্চয়ই তারচে অনেক বেশি সামর্থ রাখেন। বিপদের তুফানে পড়ে আপনি কি অসংখ্যবার আল্লাহর সাহায্যে তা থেকে মুক্তি লাভ করেন নি? আগে যেমন তিনি সাহায্য করেছেন এবারও মুশকিল আসান তিনিই করবেন।' বললেন আলী বিন সুফিয়ান।

আরো একটি রাত মরুভূমিতেই কাটলো তাদের। শেষ রাতের দিকে কায়রো শহরের আবছা অবয়ব ভেসে উঠল দূর থেকে। একটু পরই সূর্য উঠলো। আঁধারের বুক চিরে স্পষ্ট হলো কায়রো শহর। সুলতান ভাবলেন, ঘুমের অতল তল থেকে শহরের [illegible] নিশ্চয়ই জেগে উঠছে। একটু পরই তাদের কলকাকলিতে মুখরিত হবে জনপদ। শান্তিপ্রিয় নিরুদ্বিগ্ন এইসব মানুষগুলোকে কিছুতেই কুচক্রীদের দয়ার ওপর ছেড়ে দেয়া যায় না। যে করেই হোক, সমস্ত প্রতিকূলতার মোকাবেলা আমাকে করতেই হবে।

তিনি স্বগতস্বরে বললেন, 'ভাইয়েরা আমার! আমি আসছি। ইসলামের আলো দিয়ে আমি দূর করে দেবো সকল আঁধার। পেঁচা আর বাদুর যেমন দিনের আলোয় পালিয়ে যায়, তেমনি পালিয়ে যাবে কুচক্রী দল। ফেতনা ও ফ্যাসাদের মূল আমি ওপড়ে ফেলে দেবো নীল দরিয়ায়। পিড়ামিডের নিচে মাটি চাপা দেবো গাদ্দারদের। একটু অপেক্ষা করো, কটা দিন সময় দাও আমায়।'

###

পাঠকদের প্রতি—

✓ এখন থেকে প্রতি এক মাস অন্তর এ সিরিজের একটি করে বই বেরোবে ইনশাইল্লাহ।

✓ মুদ্রণ ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি না পেলে প্রতি খণ্ডের দাম থাকবে ৩০/=।

✓ আমরা চাই আপনি আপনার পাশের দোকান থেকেই প্রতিটি কপি সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে দোকানদারকে বই সংগ্রহে উৎসাহিত করুন।

যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে—

✓ নিজে আহবায়ক হয়ে অন্তত দশ জন সদস্য নিয়ে 'ক্রুসেড পাঠক ফোরাম' গড়ে তুলুন এবং সিরিজটিকে আরো জনপ্রিয় করতে পরামর্শ পাঠান ও পদক্ষেপ নিন।

✓ অগ্রিম টাকা পাঠানোর ভিত্তিতে পাঠক ফোরামকে ৩০% কমিশনে বই সরবরাহ করা হয়। ডাক খরচ আমাদের। পাঠক ফোরাম ছাড়াও বিভিন্ন পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সুযোগ ভোগ করতে পারেন।

✓ প্রতিটি খণ্ড বেরোনোর সাথে সাথে পাঠক ফোরামকে জানানো হয়।

বই বিক্রেতাদের প্রতি—

✓ জনপ্রিয় এ সিরিজের বই বিক্রি করে আপনিও হতে পারেন প্রচুর লাভবান। এজেন্ট ও বিক্রেতাদের সত্যিকার অর্থেই আশাতীত উচ্চ হারে কমিশন দেয়া হয়।

✓ সিরিজটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাওয়ায় আমরা সারা দেশে সহজ শর্তে এজেন্ট নিয়োগ করছি। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পাঠক ফোরামকে বই সরবরাহের দায়িত্বও এজেন্টগণ পালন করতে পারেন।

পরবর্তী বই

ক্রুসেড – ৬

আবারো সংঘাত

গাজী সালাহউদ্দীন সেই অসামান্য সেনাপতি,
অজস্র কুটিল ষড়যন্ত্র, ভয়াবহ সংঘাত আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের
মধ্য থেকে যিনি ছিনিয়ে এনেছিলেন বিজয়।
খ্রিস্টানরা চাচ্ছিল দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামের নাম নিশানা
মুছে দিতে, তাদের সহযোগিতা করছিল ক্ষমতালোভী,
বিলাসপ্রিয় মুসলিম আমীর ওমরারা।
কৈশোরেই তিনি হাতে নিয়েছিলেন অস্ত্র, জীবন পার করেছেন
এমন সব অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্য দিয়ে যা কল্পনা করতেও
শিউরে উঠে মানুষ। বীরত্ব ও মহানুভবতার এমন সব দৃষ্টান্ত
স্থাপন করেছিলেন, যার কারণে শত্রুর চোখেও হয়ে উঠেছেন
'গ্রেট সালাদিন'।
ইতিহাসে তাঁর সংঘাত, সংঘর্ষ ও বিজয়ের বিস্তর কাহিনী
থাকলেও পাশ্চাত্য লেখকরা খ্রিস্টানদের লেলিয়ে দেয়া
সেইসব গুপ্তচররূপী
ছলনাময়ী রূপসী নারীদের কথা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে,
যারা বার বার আঘাত হেনেছে আয়ুবীকে।
সালাউদ্দীন আয়ুবীর সেইসব অকথিত কাহিনী এবং অবিশ্বাস্য
ঘটনাবহুল জীবনের শিহরিত ও রোমাঞ্চকর বর্ণনায় ভরপুর
'ক্রুসেড' সিরিজের ভূবনে সবাইকে স্বাগতম।

এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মত বই

মূল্যঃ ত্রিশ টাকা